# বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত
একটি সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা

ষষ্ঠদশ বর্ষ □ তৃতীয় সংখ্যা | জুলাই-সেপ্টেম্বর 1994 | পাঁচ টাকা

## এই সংখ্যায় থাকছে

গলফ্ খেলার নেপথ্যে

পর্যটন ও পরিবেশ : গোয়া

পরিবেশ দূষণের ঐতিহাসিক রূপরেখা

আক্রান্ত নর্মদা আন্দোলন

এইড্সের সত্যি-মিথ্যা

নিরাপত্তাহীন নির্মাণকর্মী

টুকরো ছবি : মফস্বলের

কেমন আছেন চটকল-শ্রমিক

প্রসঙ্গ : ডিপো-প্রভেরা

বিশ্বকাপ : একটু ভাবুন

## আমাদের কথা

ভ্রমণের আনন্দ অতীব নির্মল। তুষারে ঢাকা পর্বতশীর্ষ বা গভীর সবুজ অরণ্য মনকে যে তৃপ্তি দেয়, সত্যিই তা সবসময় ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তবে এখনকার যুগে সরল আনন্দের মধ্যেও ছায়া এসে পড়ে। আর্থিক স্বচ্ছলতার সুযোগে বা কর্মক্ষেত্রের ভ্রমণ-ভাতার সাহায্যে বহু মানুষই আজকাল বেড়াতে যান যাঁদের সংবেদনশীলতার অভাব কি মানুষ, কি পরিবেশ, সব ক্ষেত্রেই চোখে পড়ে। হিমালয়ের পথে প্লাস্টিক আর পলিথিনের জঞ্জাল তো এখন বিপদসীমা অতিক্রম করে গেছে।

তবে এসব ছাড়াও পর্যটনের একটা নিজস্ব সমাজতত্ত্ব আছে। কোনো দুর্গম অথচ সুন্দর এলাকায় দলে দলে দেশী-বিদেশী ট্যুরিস্ট আসতে শুরু করলে সেই এলাকায় হোটেল, রিসর্ট, দোকান-বাজার তৈরী হয়, টাকা আসে। পাশাপাশি নোংরা জমে, জলকষ্ট শুরু হয়। এবং এইসব কিছুকে ঘিরে সেই এলাকার সামাজিক চালচিত্র, প্রাকৃতিক পরিবেশ সবকিছুই বদলাতে শুরু করে।

আলোচনাটা করছি কারণ ভারতের নয়া অর্থনীতিতে পর্যটনকে আজ এনার্জি, টেলি-যোগাযোগ বা যানবাহন ব্যবস্থার মত 'কোর সেক্টরে' স্থান দেওয়া হয়েছে। আশা করা হচ্ছে 'ট্যুরিজম' আমাদের জন্য সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম যে আজ থেকে তিন বছর বাদে ভারতে বিদেশী পর্যটক আসবে পঞ্চাশ লক্ষের মত, সঙ্গে নিয়ে আসবে বিদেশী মুদ্রায় প্রায় 660 কোটি টাকা, আর এঁদের আন্তর্জাতিক

# বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

লেখা বা রিপোর্ট পাঠানো বা অন্যান্য যে কোন কারণে যোগাযোগ—

(1) অভিজিত লাহিড়ী
পি—252, লেক টাউন, ব্লক-এ,
কলিকাতা—700 089, ফোন—34-7982

(2) সুভাষ গাঙ্গুলী
বি—22/8, করুণাময়ী
হাউজিং এস্টেট, সল্ট লেক,
কলিকাতা—700 091, ফোন—359-0297

মানের আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য দেবার জন্য হোটেল তৈরী করতে এগিয়ে আসবে আমেরিকা, ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়ার কিছু কোম্পানী।

তাই পর্যটন আজ আর শুধু আপনার, আমার পুরী-ভ্রমণে সীমাবদ্ধ থাকছে না, বিশ্ব-বাজারের ছোঁয়ায় তার চেহারাটা বদলাচ্ছে।

আমাদের চিন্তা এখানেই। তাই আমরা সংগ্রহ করেছি কয়েকটি লেখা, পর্যটনকে ঘিরে। উদ্দেশ্য একে ভাল করে খতিয়ে দেখা।

.....

এ বছর হিরোশিমা দিবসের কাছাকাছি সময়েই চোখে পড়ল খবরের কাগজে বেরিয়েছে—আমেরিকার পারমাণবিক অস্ত্রের পাল্লার মধ্যেই আছি আমরা। হিরোশিমা দিবসের প্রাসঙ্গিকতায় এ সংবাদ যথেষ্টই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা সেই ভয়ঙ্কর দিনটির পর থেকে প্রতি বছর 6 আগস্টই দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষ দাবী জানাচ্ছিলেন পৃথিবীকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত করা হোক। সেই আওয়াজে গলা মিলিয়ে আমরাও আমাদের ছোট ছোট উদ্যোগকে একত্রিত করেছিলাম 1982 সালে গণবিজ্ঞানের এক বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাভিত্তিক প্রয়াসে। নানান ধরণের, নানান মতের মানুষ সেদিন বৃষ্টিতে ভিজে পথ হেঁটেছিলেন কলকাতার বুকে, এক প্রতিবাদী মিছিলে।

না, আজ বারো বছর পরেও সে স্বপ্ন সফল হয়নি। দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে আজ আমেরিকা আছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই। তবে রয়েছে তার পারমাণবিক উত্তরাধিকার নিয়ে নানান গণ্ডগোল। প্লুটোনিয়াম চোরা-চালান, উত্তর কোরিয়াকে ঘিরে যুদ্ধের সম্ভাবনা। চেরনোবিল দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পরেও পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি বিপজ্জনকভাবে বিষ ছড়িয়ে যাচ্ছে দুনিয়া জুড়েই।

তাই পরমাণু বিরোধী সংগ্রাম আজও খুব গুরুত্বপূর্ণ লড়াই। আমাদের এখনও অনেক পথ হাঁটতে হবে।

## সূচীপত্র

আমাদের কথা—1 ☐ খেলার ছলে / বনশ্রী, তপন—3 ☐ পর্যটন. পরিবেশ ও উন্নয়ন / সুরঞ্জন কর—8 ☐ নর্মদা ও জঙ্গল চক্র / র চ—10 ☐ বিষয় পরিবেশ / রবীন মজুমদার—11 ☐ নর্মদা আন্দোলনের অফিসে হামলা / বীণা শ্রীনিবাসন—15 ☐ এইডস্, থাইল্যান্ড ও সংবাদমাধ্যম—19 ☐ এইডস্ সম্ভাবনা-ভারতে / প্রদীপ দত্ত—23 ☐ নির্মাণকর্মীরা আজও অসংগঠিত / র চ—25 ☐ মফস্বলের চালচিত্র—26 ☐ শ্রমিক এলাকায় স্বাস্থ্য ও পরিবেশ / বিশু—28 ☐ লাভ ক্যানেল / অনুঃ কাজল রায়—31 ☐ ডিপো-প্রভেরা / অমিতা—33 ☐ নর্মদা উপত্যকায় এখন / র চ—37 ☐ স্কুল পাঠ্যে 'মানবাধিকার বিষয় / র চ—38 ☐ বিশ্বকাপ একটু ভাবুন—39।

# খেলার ছলে

প্রসঙ্গ গোয়া ঃ এক

[ 'বাইলাঞ্চো সাদ্' হল গোয়ার নারীদের এক সচেতন যৌথ উদ্যোগের নাম। 'বাইলাঞ্চো' শব্দটির অর্থ হল মহিলা। গোয়ার মহিলারা এই সংগঠনের মাধ্যমে প্রয়াস নিচ্ছেন এমন এক ন্যায়-ভিত্তিক এবং মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে, যেখানে নারী-পুরুষ সমান অধিকারের জোরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারবে। 'সাদ্' মনে করে যে (এক) সাধারণভাবে মেয়েদের জীবনে ( বিশেষ ভাবে গোয়ার পটভূমিতে ) নিপীড়ন এবং তাদের অবস্থান—একে বুঝতে হবে এবং তলিয়ে দেখতে হবে। (দুই) সাধারণ জন সমাজে নারীদের সম্পর্কে সচেতনতাকে বাড়াতে হবে। (তিন) নারীদের সাহায্য করতে হবে যাতে তারা আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারে, তাদের নিজেদের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং নিজেদের সুন্দর কাজকর্ম করার ক্ষমতাকে বাড়াতে পারে। (চার) মেয়েদের সমস্যা-জনিত বিষয়কে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। (পাঁচ) দেশে-বিদেশে মেয়েদের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা গড়ে তুলতে হবে। এই সব লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখেই সাদ্ একদিকে ব্যক্তিগত স্তরে স্ত্রীকে মারধোর, মহিলাদের উত্ত্যক্ত করা, ধর্ষণ, কাজের জায়গায় মেয়েদের ছোট চোখে দেখার মত বিভিন্ন দুষ্কর্মের সাধ্যমত প্রতিকার করার চেষ্টা করে অন্যদিকে সামাজিক স্তরে বিভিন্ন বিষয় যেমন সংবাদ মাধ্যমে নারী শরীরকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা বা কন্যা সন্তান না চাওয়ার মত সমস্যাগুলোকে নিয়ে প্রচার অভিযান গড়ে তোলে, পুস্তিকা, লিফ্লেট প্রকাশ করে।

গোয়ায় গলফ্ খেলার মাঠ (গল্ফ কোর্স) তৈরী করার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করতে এবং এর জন্য দায়ী সরকার এবং তার 'বিকাশনীতি ও পরিকল্পনা'কে অভিযোগ করে 1993 সালের নভেম্বর মাসে সাদ্ একটি ছোট্ট বই প্রকাশ করে। নাম—ইন্ দ্য নেম অফ এ গেম ঃ দ্য স্টেক্স ইন্ গলফ্। গলফ্ কোর্স শুনলে সাধারণভাবে মনে ভেসে ওঠে নীল আকাশ, ঘন সবুজ মাঠ এবং সুবেশ লোকজনের ঘোরাফেরা। তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে এর সাথে যেন গোয়ার নীচের তলার মানুষের জীবন, গোয়ার পরিবেশ, ধ্বংস হওয়ার কোনও সম্পর্কই নেই ; নির্দোষ খেলাধুলা না নারীদের জন্য বাড়তি খাটনি, বাড়তি যন্ত্রণা ? —তাই এই পুস্তিকা। যার ভূমিকায় তাঁরা গলফ্ কোর্স তৈরীর মত ঘটনার সাথে তুলনা করেছেন ভেড়ার চামড়ায় সর্বাঙ্গ ঢেকে আসা নেকড়েকে।

আমাদের লেখাটি তৈরী হয়েছে এই পুস্তিকাটি থেকে তাঁদের জবানীতেই। মূলে যদিও এটি সম্পূর্ণ প্রশ্ন-উত্তরের আদলে রচিত, এখানে সেটি একটু বদলানো হল। ]

আমাদের দেশে গল্‌ফ কোর্স ও তৎসংলগ্ন বিলাসবহুল রিসর্ট তৈরী করার একমাত্র কারণ মুষ্টিমেয় কিছু বিত্তবান লোক ও বিদেশী পর্যটকদের বিনোদনের বন্দোবস্ত করা। গল্‌ফ একটা অত্যন্ত ব্যয়-সাপেক্ষ খেলা। গল্‌ফ খেলার জন্য ব্যবহৃত নানা ধরনের ব্যাট বা ক্লাব-এর একেকটি সেটের দাম কুড়ি থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং একবার গল্‌ফ খেলার জন্য গড় খরচ হয় 600-700 টাকা। স্বভাবতই এই খেলা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে। ভারত সরকার গোয়ার নাকুয়েরি-কুইটল এবং ভারনাতে গল্‌ফ কোর্স বানানোর জন্য বিশাল জমি অধিগ্রহণের জন্য চিহ্নিত করেছেন পঞ্চায়েতকে না জানিয়ে। জমি অধিগ্রহণের সরকারী হিসাব—(1) ভারনা (স্যালশেট)—6,400,00 স্কোঃ মিঃ (2) অ্যামথানে (বিচোলিম) 4,92,000 স্কোঃ মিঃ (3) বেতুল/নাকুয়েরি-কুইটল (স্যালশেট)—10,00,000 স্কোঃ মিঃ। এ ছাড়াও চারটি গল্‌ফ কোর্স প্রস্তাবাধীন রয়েছে। এই সিদ্ধান্তের বহু পরে পর্যটন দপ্তর আমাদের (বাইলাঞ্চো সাদ-গোয়া) এক চিঠির উত্তরে একথা জানায়। মালভূমির যে জমিগুলো সরকার অধিগ্রহণ করার কথা বলছেন তা সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য চিহ্নিত জমি 'কমিউনিডাড', যা থেকে অসংখ্য মানুষ তাঁদের গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত করেন। সরকার অত্যন্ত নির্মমভাবে, মালিকের ইচ্ছের বিরুদ্ধে, জোর করে, অধিগ্রহণ আইনের সাহায্যে জমি দখল করছেন। এই ধরনের হঠাৎ অধিগ্রহণ জমির দাম বাড়িয়ে দেয়, গৃহ সমস্যার সৃষ্টি করে। যে সব জায়গায় মানুষ স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে তাকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে করে দেয়। সমুদ্র সৈকতের সমস্ত ভালো ভালো জায়গা এইভাবে বিত্তবানদের হোটেল ও রিসর্টের কব্জায় চলে গেছে। সেই একই জিনিষ এখন হতে চলেছে গল্‌ফ কোর্সের ক্ষেত্রে। ভারত সরকার বিদেশী পর্যটকদের জন্য হাজার হাজার বর্গ মিটার জমি ছিনিয়ে নিচ্ছেন কিন্তু গোয়ার জনসাধারণের প্রিয়তম খেলা ফুটবলের জন্য একটা ছোট্ট মাঠের অভাব অনেক জায়গাতেই এবং সরকারের সে বিষয়ে কোনও হুঁশই নেই।

শুধু যে সাধারণ মানুষ এই বিস্তীর্ণ জায়গার ওপর অধিকার হারাবেন তা নয়, মালভূমির এই উঁচু জমিতে গড়ে ওঠা গল্‌ফ কোর্সগুলোতে ব্যবহৃত যাবতীয় বিষাক্ত পদার্থ (কীটনাশক ইত্যাদি) বৃষ্টির জলে ধুয়ে এসে মাঠ, নদী ও জলের উৎসগুলোতে মিশে যাবে। যার ফলে ধান, মাছ ও গোয়াবাসীর জলের উৎসগুলো সব বিষিয়ে যাবে। গল্‌ফ কোর্স প্রবর্তক ব্যবসায়ীরা বাজারে একটা শ্লোগান চালু করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে—গল্‌ফ কোর্স পরিবেশের বন্ধু। আসুন আমরা ওদের যুক্তিগুলোকে একে একে বিচার করে দেখি। ওঁদের প্রথম দাবী গল্‌ফ কোর্সগুলোতে প্রাকৃতিক সার ব্যবহার করা হবে যাতে রাসায়নিক সারের বিষক্রিয়া না দেখা যায়। একটা মাঝারি মাপের কোর্স 50 থেকে 75 হেক্টর (1 হেক্টর=10,000 বর্গ মিটার) জমির ওপর বিস্তৃত। সারা বছরে যদি সমস্ত জমির ওপর 6 ইঞ্চি পুরু গোবর সার দিতে হয়, তাহলে মোট 75,000 থেকে 1,12,500 ঘন মিটার (কিউবিক মিটার) গোবর সার প্রয়োজন হবে। একটা গরু সারা বছরে 1-2 ঘন মিটার গোবর দেয়—অতএব শুধু গল্‌ফ কোর্সের জন্য প্রয়োজন হবে 37,500 থেকে 56,250 গরু। এত গরু কি জোগাড় করা সম্ভব হবে উদ্যোক্তাদের পক্ষে ?

গল্‌ফ কোর্সের উদ্যোক্তাদের অন্য দাবী কোর্সের প্রয়োজনের জন্য জল কোর্সের মধ্যেই জমিয়ে রাখা হবে ও একই জল বার বার ব্যবহার করা হবে। ফলে সমস্ত বর্জ্য পদার্থই পরিশোধিত হয়ে জমিতে ফিরে যাবে, জলের উৎসগুলো দূষিত হবে না। এটা একটা অসম্ভব দাবী। এমন দাবী অবশ্য ওঁরা আগেও করেছেন এবং কখনই এসব প্রতিশ্রুতি পালন করেননি। যদিও ওঁরা সবাই জানেন যে গোয়ায় খুব জলের কষ্ট তবুও বহু তারকা-

খচিত হোটেলগুলোর সবুজ মাঠের জন্য বা তাদের সাঁতারের পুলের জন্য বা অতিথি অভ্যাগতদের সেবার জন্য জল যোগাতে হয় এই গোয়াকেই। গল্‌ফ কোর্সের ব্যাপারে এর অন্যথা ঘটবে এমন মনে করার কোনও কারণ আছে কি? যে সব লোকজন গল্‌ফ কোর্স তৈরীর ব্যাপারে উৎসুক তারা প্রায় সকলেই পরিবেশ দূষণের দোষে দোষী। যেমন নাকুয়েরি-কুইটলে গল্‌ফ কোর্সের প্রবর্তক লীলা বীচ্‌ রিসর্টের মালিকপক্ষ। গোয়ায় তাদের বহু তারকাখচিত হোটেলে আবর্জনা পরিশোধনের সমস্ত সরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও তারা সেগুলো ব্যবহার না করে প্রতি সন্ধ্যায় যাবতীয় আবর্জনা 'সাল' নদীতে ফেলছে। এসব তারা করতে পারছে রাজনৈতিক মহলে বহুজাতিক ব্যবসায়ী বলে তাদের খাতির আছে বলেই। এই সমস্ত সংস্থা গোয়ার সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা ভেবে গল্‌ফ কোর্সের বিশেষ জলের ব্যবস্থা করবেন এটা ভাবা বাতুলতা নয় কি? সত্যি কথাটা অবশ্য গ্লোবাল অ্যান্টি গল্‌ফ মুভমেন্ট-এর সদস্যরা বলেছেন, 'এমন কোন গল্‌ফ কোর্স আজ অবধি হয়নি যা পরিবেশের বন্ধু। কারণ গল্‌ফ কোর্সের 'নিখুঁত সবুজ' সৃষ্টির জন্য চাই বিদেশী ঘাস, আর তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চাই বিষাক্ত রাসায়নিক কীটনাশক। এমন কি কোর্স তৈরীর আগে থেকেই মাটি শক্ত করার জন্য চাই বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ যেমন হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড।'

তাছাড়া গল্‌ফ কোর্সের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য (গল্‌ফ কোর্স ল্যান্ডস্কেপিং) স্থানীয় লতা গুল্ম, ঝোপঝাড়, গাছপালা সব তুলে ফেলতে হবে, মাটির ঢাল পরিবর্তন করতে হবে। সমান করতে হবে জমি। স্কটিশ পার্বত্য অঞ্চলের ধাঁচে ভারনাতে গল্‌ফ কোর্স গড়ে তুলতে 15,000 ট্রাক বোঝাই মাটি লাগবে। কোথা থেকে আসবে এত মাটি? আমাদেরই কিছু টিলাকে ধ্বংস করা হবে যার প্রভাব পড়বে পরিবেশের ওপর। জলকে ধরে রাখার ক্ষমতাসম্পন্ন ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ সহনশীল পুরোনো জাতের ঘাস তুলে ফেলার ফলে মাটির নীচের জলের স্তর আরও নীচে নেমে যাবে। ব্যাধি ও পোকা-মাকড়ে সহজে আক্রান্ত হয় এমন বিদেশী লতাগুল্মের সাহায্যে এক কৃত্রিম সবুজ সংস্কৃতি তৈরী করবে গল্‌ফ কোর্স।

গল্‌ফ কোর্স নিয়ে এই অভিজ্ঞতা এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোর অনেকেরই। ব্যাংককের একটি খবরের কাগজে প্রকাশিত হিসাব অনুসারে প্রতিযোগিতা হয় এমন একটা গল্‌ফ কোর্সে প্রতিদিন যে জল লাগে তা 15,000 শহরবাসী বা 60,000 গ্রামবাসীর একদিনের জলের প্রয়োজনের সমান। ভারত সরকার অবশ্য বলেছেন গল্‌ফ কোর্স প্রবর্তকদের নিজেদের জল নিজেদের জোগাড় করতে হবে। কিন্তু প্রকৃতির যে জলের ভান্ডার তার বাইরে কোথায় পাবে তারা এত জল? জল ধরে রাখতে পারে এমন গাছপালা কেটে ফেলা ও বিপুল পরিমাণে ভূগর্ভস্থ জল ব্যবহার করার ফলে আশে পাশের কুঁয়ো, পুকুর সব শুকিয়ে যাবে। তার মানে, নিজেদের প্রয়োজনের জল আনতে তখন আমাদের আরও দূরে যেতে হবে। সামাজিক রীতি অনুযায়ী যেহেতু জল আনাটা মেয়েদের কাজ, তাই সরকারী উন্নয়ন-এর ফলে সবচেয়ে বেশী চাপটা পড়বে মেয়েদের ওপরই।

শুধু জল আনাই নয়, সাংসারিক খরচপাতির হিসাব রাখা কিংবা পারিবারিক স্বাস্থ্যের তদারকি করাটাও মেয়েদেরই কাজ। সেদিক দিয়েও আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ আছে। গল্‌ফ কোর্সের বিদেশী সবুজকে ধরে রাখতে বছরে প্রায় 15,000 কেজি বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের দরকার হয়—যার শরীরের ওপর নানা কু-প্রভাব আছে। জাপানের ন্যাশনাল ডক্টরস্‌ হেলথ্‌ ইনসিওরেন্স অ্যাসোশিয়েশন-এর সমীক্ষা থেকে জানা গেছে গল্‌ফ খেলোয়াড়, ক্যাডি, মালি ও কোর্সের খুব কাছাকাছি যারা থাকে তাদের প্রায়ই চর্মরোগ, নাক-কান-গলা ও

শ্বাস প্রশ্বাস সংক্রান্ত নানা রোগ হয়। সুতরাং, গল্‌ফ কোর্স যে শুধু আমাদের ব্যবহার্য জমি গ্রাস করবে ও জলের অভাব ঘটাবে তাই নয়—আমাদের প্রিয়জনদের স্বাস্থ্যের হানি করে বাড়ীর মেয়েদের ঝামেলা আরও বাড়াবে।

সরকার দাবী করেছেন যে গল্‌ফ কোর্স করার জন্য সরকারকে কোনও অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে না—বিনিয়োগের দায়িত্ব গল্‌ফ কোর্স প্রবর্তকদের। আর এই গল্‌ফ কোর্সে আসা বিদেশী পর্যটকদের থেকে দেশে বিপুল পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা রোজগার হবে, তাছাড়া গল্‌ফ কোর্স স্থানীয় মানুষদের জন্য চাকরীর সুযোগ সৃষ্টি করবে। আসলে সরকার যখন এসব দাবী করেন তখন মনে করেন আমরা চোখে ঠুলি পড়ে থাকি। গল্‌ফ কোর্স যেখানে তৈরী হবে সেখানে চাই নদীর ওপর বাঁধ, রাস্তা, ব্রিজ, বিমান বন্দর, নৌবন্দর ইত্যাদি যার কথা কোথাও বলা হয় না। এছাড়া আছে বিদেশী পর্যটকদের জন্য দামী থাকার জায়গা, বিনোদনের ব্যবস্থা, আমদানি-নির্ভর চাষবাস (ফুল, বিদেশী ফল, সব্জী)। গল্‌ফ কোর্স উন্নয়ন প্রকল্পের এইসব না বলা কাজের জন্য কে অর্থ দিচ্ছে, ভরতুকি দিচ্ছে ? —কাদের টাকা খরচ হচ্ছে ?

আর বিদেশী মুদ্রা ? খেলার আন্তর্জাতিক মান রক্ষা করতে, গল্‌ফ খেলার সাজ-সরঞ্জাম, মাঠের রক্ষণাবেক্ষণের যন্ত্রপাতি, বিদেশী গাছ ও তার সার ইত্যাদিতে অথবা বিভিন্ন বিদেশী সংস্থাকে লভ্যাংশ দিতে বা বিদেশী গল্‌ফ কোর্স নকশাবিদদের দক্ষিণা দিতে তা আবার বিদেশেই ফিরে যায়। থাইল্যাণ্ডে একটা গল্‌ফ কোর্স তৈরী করতে 200-300 জন লোক লাগে। তৈরী হয়ে যাবার পর মালী, দারোয়ান সব মিলিয়ে 30-40 জন লাগে। জল দেবার, ঘাস কাটার, কীটনাশক ছেটানোর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি এসে গেলেই এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় 10-এ. বিনিয়োজিত জমি ও জলের পরিমাণের তুলনায় যা একেবারেই নগণ্য। ক্যাডি (যারা খেলোয়াড়ের গলফ ব্যাগ বয়ে বেড়ান) হিসাবে কিছু অস্থায়ী চাকরী অবশ্য পাওয়া যায়। থ্যাইল্যাণ্ডের গল্‌ফ খেলোয়াড়রা যেমন নিজেদের রাজার মতন মনে করেন। একজন খেলোয়াড়কে 6 জন ক্যাডি দেওয়া হয়—একজন বল খোঁজে, একজন ব্যাগ বয়, একজন খেলোয়াড়ের মাথায় ছাতা ধরে, একজন সঙ্গে সঙ্গে পানীয় নিয়ে যায়। অতএব গল্‌ফ কোর্সে যে কর্মসংস্থান হবে তা শুধু দাস মনোভাবকে চাপিয়ে দেয়। আর এটাই হল সরকারের গল্‌ফ কোর্স উন্নয়ন প্রকল্পের নীট লাভ ! আরেকটা লাভও অবশ্য আছে। বিদেশেও বহু জায়গায় এটা দেখা গেছে যেখানে যেখানে গল্‌ফ কোর্স তৈরী হয়েছে সেখানে অপরাধীর সংখ্যা বেড়ে গেছে। গল্‌ফ কোর্স তৈরীর জন্য যারা এগিয়ে আসে তাদের বেশির ভাগই কালো টাকার মালিক। এরা জমি সংগ্রহ ও অন্যান্য নানা কাজের জন্য ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনীকে নিয়োজিত করে। যেমন হয়েছিল গোয়াতে পর্যটন উন্নয়নের সময়। অতি সম্প্রতি লীলা বীচ্ রিসর্টের অধিপতিরা অসহায় মহিলা ভাড়াটেদের ওপর হামলা চালিয়েছে। আমাদের আশঙ্কা একই ঘটনা ঘটবে গোয়ায় গল্‌ফ কোর্স গড়ে তোলা নিয়ে।

অবশ্য এমন নয় যে গোয়াতে যেভাবে গল্‌ফ কোর্স গড়ে তোলা হচ্ছে তেমন ভাবে না করে অন্য কোন ভাবে গড়ে তুললে আমরা খুশি হতাম। কারণ সারা পৃথিবীর অভিজ্ঞতা হল 18 গর্তের গল্‌ফ কোর্সগুলো স্বভাবগত দিক নিয়েই পরিবেশের পক্ষে বিপজ্জনক। আর অভিজাতদের এই খেলার সাথে যে সংস্কৃতিটা জড়িয়ে আছে তা আদ্যোপান্ত ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি। এ খেলা আমরা শিখতেই চাইনা—দক্ষতা অর্জন তো দূরের কথা। খেলার কথা যদি হয় তবে বলে রাখি ফুটবল গোয়াবাসীর প্রিয় খেলা। সরকার তার জন্যে কোনও উদ্যোগ নিলে আমরা আগ্রহী। আর উন্নয়নের কথা যদি তোলেন সরকার, তাহলে স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই আমরা এমন উন্নয়ন চাই

না যা মহিলাদের কাজ বাড়ায় বা তাঁদের কাজকে আরও পরিশ্রমসাধ্য করে তোলে অথবা স্থানীয় মানুষদের বেঁচে থাকার প্রশ্নটাকে গৌণ মনে করে। আমরা সেই উন্নয়ন চাই যা মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটায়, যা পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীল, যা স্বাভাবিক চরিত্রের ধারক, যা শ্রমকে সংহত করে, যা নারী-পুরুষের শারিরীক গঠন-পার্থক্যের প্রতি সংবেদনশীল এবং যা প্রতিটি উন্নয়নমূলক চিন্তার সাথে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করে।□

**সংক্ষিপ্ত অনুবাদ—বনশ্রী, তপন**

**মূল পুস্তিকা :** ইন দ্য নেম অফ এ গেম : দ্য স্টেক্স ইন গলফ্
( ফর প্রাইভেট সার্কুলেশন অনলি )—অনুদান চার টাকা।

**যোগাযোগের ঠিকানা :** বাইলাঞ্চো সাদ্—গোয়া, কে/অ 304, প্রেমা বিল্ডিং
রুয়া ডে আউরেম—পাঞ্জিম—গোয়া, পিন—403001

---

## একটি আবেদন

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকা ত্রৈমাসিক হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। 1994 সালের জন্য গ্রাহক হোন।

গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক 16 টাকা।

( বিশেষ ক্ষেত্রে বার্ষিক 10 টাকা। )

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'—এই নামে ব্যাঙ্ক-ড্রাফট বা মানি-অর্ডার করে টাকা পাঠাতে পারেন। কুপনের নীচে স্পষ্টভাবে নাম-ঠিকানা লিখবেন।

---

**বন্ধ ও রুগ্ন কল-কারখানা সংক্রান্ত পুস্তিকা ও অন্যান্য তথ্যাদির জন্য যোগাযোগ করুন—**

**নাগরিক মঞ্চ**

134, রাজেন্দ্র লাল মিত্র রোড,

রুম নং—7 ব্লক-বি

কলিকাতা—700085

---

# পর্যটন, পরিবেশ ও উন্নয়ন

প্রসঙ্গ গোয়া ঃ দুই

॥ প্রথম অধ্যায় ॥

গোয়া বললেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে পাহাড়, সমুদ্র আর সবুজের স্বপ্ন, ভ্রমণ পিপাসু মন যে দিকে যেতে চায়। সত্যিই, প্রতিবেশী মহারাষ্ট্রের যে কোনও জেলার থেকে ছোট্ট এই গোয়ার আছে এক সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ আর পর্তুগীজ ধাঁচের কিছু চমৎকার স্থাপত্যকলার নিদর্শন। এখানকার সমুদ্র সৈকত তো পৃথিবী বিখ্যাত। তাই দেশ-বিদেশ থেকে প্রচুর ট্যুরিস্ট এখানে আসেন। তবে শুধু 'সাইট-সিইং'ই নয় অনেকের কাছেই গোয়া হল ফূর্তি করার জায়গা। আর 'ফূর্তি' বলতে আজ যা যা বোঝায়, গোয়াতে তার বন্দোবস্ত রয়েছে পুরোদমে। মদ সস্তা, পাওয়াও যায় অঢেল ( প্রতি 40 জনে একটি লাইসেন্স-সহ বার। বেআইনী যে কত তার হিসেব কে রাখে !)। সমস্ত আমোদ প্রমোদের সুবিধে সহ হোটেল, সুইমিং পুল, সমুদ্রের ধারে নির্ঝঞ্ঝাটে সূর্য-স্নানের ব্যবস্থা, মহিলা সঙ্গী, আরও কত কি ? তাই শুধু ভারত উপমহাদেশ নয়, ইউরোপ-আমেরিকার ফূর্তি করতে চাওয়া মানুষরাই বেশী করে ভিড় জমান এখানে। বিশেষত যেখানে 'ডিভ্যালুয়েশনের' দৌলতে সামান্য কটা ডলার ফেললেই রাজার মত সবকিছু উপভোগ করা যাবে। আর এসবই স্বাগতম। কারণ গোয়ায় টাকা আসছে। ডেভেলপমেন্টের পথ তো এটাই !

হ্যাঁ, টাকা তো আসছেই। ধরুন সমুদ্রের ধারে আনজুনা, ভ্যাগাটর বা মান্ডেমের কথা। এসব জায়গায় প্রায়ই তিন চার হাজার বিদেশী জড়ো হন। আর তাঁদের আনন্দ দেবার জন্য সমুদ্র সৈকতে আয়োজন করা হয় 'বীচ পার্টি'র। শোনা যায় প্রতি খেপের জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষকদের সাথে নাকি হাজার দশেক টাকায় রফা হয়। ছোট জেনারেটর লাগিয়ে দেওয়া হয় যাতে অধিক শক্তিশালী স্পিকারে চড়া সুরের গান-বাজনা চারদিক কাঁপিয়ে দিতে পারে। মদ, ড্রাগ, শরীরী আনন্দ সব কিছুরই ঢালাও ব্যবস্থা থাকে। রাত এগারটায় শুরু—আর চলতেই থাকে, এমন কি পরের দিন সকাল এগারটা অবধি। এসব সময়ে কোনও কর্তৃপক্ষের ছায়া পর্যন্ত দেখা যায় না। অবশ্য নিরাপত্তার ব্যবস্থার জন্য রয়েছে গুন্ডারা।

উচ্ছৃঙ্খল আমোদ-প্রমোদের এই বাঁধভাঙা বাজারি জোয়ারের সাথে গোয়ার মানুষের কি সম্পর্ক সেটা কিন্তু সত্যিই অন্য ছবি। সারাদিন খাটুনির পর ঘুমিয়ে পড়া গ্রামে নিশুতি রাত ভেদ করে ছুটে আসে উৎকট চীৎকার, উন্মত্ত ড্রামের আওয়াজ। সবার চোখে কিন্তু ঘুম আসে না, কারণ খাটা-খাটনির জন্য ভাড়া করা হয়েছে গ্রামেরই কিছু নারী ও শিশুকে। উৎসাহ দেওয়া হয়েছে গ্রামের কিছু ছাত্র ও যুবককে যাতে তারাও ঢুকে পড়তে পারে এই ফূর্তির সাগরে।

এটা ঠিক যে গোয়ার মানুষের সত্যিই ছিল এক উচ্ছল প্রাণবন্ত নাচ-গানের সংস্কৃতির রেওয়াজ। কিন্তু যা ছিল এক সমাজের নিজস্ব লোক-সংস্কৃতি, তার মধ্যে আজ বাজার ঢুকে

পড়ে তাকে চরমভাবে বিকৃত করছে। 'কানি'ভাল কালচার' তথা শুধুই আমোদ প্রমোদের ইমেজ সামনে রেখে তা গোয়া জুড়ে মধ্যবিত্তের ঘর ভাঙছে, সমাজের নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র মানুষের জীবনের মর্যাদা নিষ্ঠুরভাবে নষ্ট করছে।

স্বস্তির বিষয় যে গোয়ার কিছু মানুষ আজ সোচ্চার হয়েছেন। একদিকে তাঁরা সংস্কৃতির নামে এই হানাদারির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছেন। অন্যদিকে রুখে দাঁড়াচ্ছেন গোয়ার জল-জঙ্গল-পরিবেশ ধ্বংসের বিরুদ্ধে। বা উষা ইস্পাতের মত শিল্প অন্যদিকে জাপানীদের গ্রাম, মার্মাগোয়ার মুক্ত বন্দর ও গল্‌ফ কোর্স এবং আরো অনেক কিছু। কিন্তু সবচেয়ে বড় নির্মাণ বোধ হয় হোটেলের ক্ষেত্রেই ঘটছে। 40টির বেশী লাক্সারী হোটেল আজ উন্নতি না অবনতি কিসের প্রতীক সে প্রশ্ন সামনে এসে গেছে। কারণ হোটেল ও তার সুইমিং পুলের জলের চাহিদা মেটাতে গিয়ে গোয়ার গ্রাম আজ শুখা। যেখানে সেখানে কনস্ট্রাকশান করতে গিয়ে স্বাভাবিক জঙ্গল, ঝোপ-ঝাড় আজ শেষ হয়ে হবে টিল্যারি সেচ প্রকল্প থেকে। গরীব মানুষ জল না পাক, 20টি গ্রামের মালিক দেশপ্রভুদের তো লাভ হবে! কারণ তাদের জমিই তো জাপানীরা নিচ্ছে। এই কিছু লোকের তাড়াতাড়ি টাকা কামানো আজ গোয়ার ইকলজির ওপর চরম আঘাত হানছে। আর সরকারি মদত? 1991 সালের ব্র্যাকিস ওয়াটার ফিস্‌ ফার্মিং রেগুলেশন বিল. অনুযায়ী ধান চাষের জন্য 'খাজান' জমির এলাকায় চিংড়ি চাষ হচ্ছে। সাধারণের জন্য নির্দিষ্ট জমিতে আজ পরিকল্পনা

---

কিছুদিন আগে খবরের কাগজের পাতায় অনেকেরই চোখে পড়েছে সেই বিজ্ঞাপন। খাঁড়ি, জঙ্গল, পাহাড়কে কেটে ছেঁটে, বাঁকিয়ে চুরিয়ে তৈরী হচ্ছে এক রেলপথ, যা গোয়ার উপকূলভাগকে কাছে নিয়ে আসবে বাকি দেশের। বিজ্ঞাপনেই দম্ভের সাথে ঘোষণা করা হয়েছে যে এই রেলপথ গোয়ার প্রাকৃতিক সম্পদকে দ্রুত এনে ফেলবে দূরদূরান্তের বাজারে। বিতর্কিত এই রেলপথের নাম 'কোঙ্কন রেলওয়েজ'।

অনেক গোয়াবাসীই মনে করেন রেলপথ যে ভাবে প্রকৃতির ওপর চাপ দিয়ে তৈরী হচ্ছে, যে ভাবে তা বাজারকে নিয়ে আসবে গোয়ার একদম ভেতরে, তা খাদ্য থেকে ইকলজি সব কিছুর ওপরই অশুভ ছাপ ফেলবে। এর বিরুদ্ধে 20 মার্চ '93 অনশনে বসেছিলেন তিন সন্তানের এক জননী আরও দু'জন আন্দোলনকারীর সাথে। সেই থেকে চেষ্টা চলছে কোঙ্কন রেলপথ নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর, এর ভাল-মন্দ নিয়ে জনমত তৈরীর এক সংঘবদ্ধ প্রয়াস।

সূত্রঃ গোয়া আপডেট

---

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় ॥

গোয়ার উপকূল অঞ্চলকে বলা হয় 'খাদ্যের ঝুড়ি' ( ফুড বাস্কেট )। মাছ, নুন, চাল, নারকেল, ফল এবং সব্জী সবই আসে এখান থেকে। আর এই উপকূল অঞ্চল ধরেই আজ গড়ে উঠছে একদিকে সিবা গেইগি, জুয়ারি অ্যাগ্রো যাচ্ছে। যার খারাপ ফল পড়ছে গোয়ার স্পর্শকাতর প্রকৃতির ওপর। শুধু হোটেল নয়, আরামবোল-পালিএম মালভূমি অঞ্চলের পেরনেম তালুকে বয়স্ক জাপানীদের জন্য তৈরী হচ্ছে এক গ্রাম। 100 কোটি টাকার এই প্রকল্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হবে 519টি পরিবার। এখানকার জন্য জল নেওয়া চাওয়া হচ্ছে বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান-গুলোর কাছ থেকে। আর এ ব্যাপারে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আগ্রহ খুবই। কারণ চিংড়ি মাছ বিদেশী মুদ্রা আনবে। কিন্তু এর জন্য বহু যুগ ধরে গড়ে ওঠা গোয়ার যে স্বাভাবিক বাঁধ ব্যবস্থা ধ্বংস হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে নদী, ধান জমি, আর নোনা এলাকা

( সল্ট প্যান ) —তার দাম কে দেবে ?

গোয়ার মানুষ এ সব প্রশ্ন তুলছেন। ট্যুরিজম বলতে কি বোঝায় ? কেমন ট্যুরিজম তাঁরা চান ? গোয়াতে শিল্প বসাতে গেলে কি এখানকার বিশেষ ধরণের পরিবেশের কথা মাথায় রাখতে হবে না ? এসব নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলছে। গোয়ার মানুষের পরম্পরা-ভিত্তিক নিজস্ব সংস্কৃতি এবং পরিবেশকে বাঁচানোর দাবীতে আন্দোলন ক্রমশ সংহত হচ্ছে। গোয়া জাগৃতি ফৌজ, বাইলাঞ্চো সাদ্, বাইলাঞ্চো ভয়েসের মত নানান সংগঠন একত্র হয়ে 1991 সালে তৈরী করেছে 'সেভ গোয়া ক্যাম্পেইন'। পেরনেম তালুকের বিভিন্ন গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে তৈরী করেছেন 'পেরনেম কোস্টাল পিপলস ওয়েলফেয়ার অ্যাকশন কমিটি', যাতে তাঁরা লড়তে পারেন বিলাসবহুল পর্যটন, গল্ফ কোর্স, জাপানী গ্রাম এসবের ক্ষতি-কারক প্রভাবের বিরুদ্ধে। গোয়ার এই আন্দোলন আজ দাবী করছে সমস্ত উপমহাদেশের মানুষের সমর্থন।

সংকলন ঃ সুরঞ্জন কর

সূত্র ঃ গোয়া আপডেট, C/o গোয়া ডেস্ক, নং 11, লিবার্টি অ্যাপার্টমেন্টস, ফেইরা আলটা, মাপুসা, গোয়া-403507

## নর্মদা প্রকল্পের পেছনেও জঙ্গল চক্র ?

কোটি শব্দটি মাত্র দু'অক্ষরের। বেশ ছোট। কিন্তু কোটি সংখ্যাটি ? মোটেই তা নয়। সংখ্যাটি বিশাল বলেই জানতাম। অন্তত কিছুদিন আগে পর্যন্তও। কিন্তু খবরের কাগজের দৌলতে এখন আর তত বিশাল মনে হয় না। কাগজ খুললেই—চুরি, স্ক্যাম, সুটকেস, কিকব্যাক।—সব কোটি অঙ্কের।

আর লক্ষ্যণীয় বিষয় হল—সব কটার সাথে জড়িয়ে আছে একই ধরণের লোকের ঘোঁট।—ব্যবসায়ী-ব্যুরোক্র্যাট-পলিটিশিয়ান। ভিন্ন ভিন্ন স্ক্যামে ঘোঁটটা শুধু আলাদা। এখন চলছে সুগার স্ক্যাম। এর পেছনেও আছে এক ঘোঁট—চিনির ঘোঁট। এতেও কোটি টাকার হাতসাফাই। কারো কারো অনুমানে প্রায় হাজার কোটি !

এই চিনি কেলেঙ্কারীর ডামাডোলে আরেকটা খবর ফস্‌কে যেতে বসেছিল। পুরনো কাগজ ঘাঁটতে গিয়ে নজরে পড়ল। জঙ্গল নিয়ে কারবার বলেই খট্‌কা বেশী। কেন,—সে কথায় পরে আসছি। আগে ঘটনাটা বলি।

খবরটা কর্ণাটকের।—কুর্গ জেলার কোদাগু জঙ্গলের। মাত্র মাস দুয়েকের মধ্যে আনুমানিক 2000 কিউবিক মিটার কাঠ পাচার হয়েছে এই জঙ্গল থেকে। সরকারী হিসেবে এর মূল্য 600 কোটি টাকা !

ছ'শ কোটি টাকার কাঠ নিশ্চয়ই কেউ রাতের অন্ধকারে বয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়নি ? রীতিমত লোক-লস্কর, ট্রাক-ট্রলি লেগেছে এই কাজে। এজন্য পারমিট, গাছে ছাপ্পা দেওয়ার বনবিভাগের সীল, রসিদ বই সবই লেগেছে। —ভুয়া হলেও। তবু কেউ Z্যান্তি-পারল না ! অবশ্য জানতে পারার কথাও নয়। কারণ ঘটনার সাথে জড়িত ছিল কর্ণাটক মন্ত্রীসভার দু'জন সদস্য, বনদপ্তরের আমলা-কর্মচারী, আর কাঠ-ব্যবসায়ী কয়েকজন।—সেই একই সেট। পলিটিশিয়ান-ব্যুরোক্রাট-ব্যবসায়ী। এ হল জঙ্গল বিষয়ের ঘোঁট।—জঙ্গল-ঘোঁট।

খবরটা পড়েই যে আশঙ্কা মাথায় এল সেটা বলে ফেলি। নর্মদা প্রকল্পের বলি হচ্ছে 57 হাজার হেক্টর বনাঞ্চল। সরকারী হিসেবেই যার মূল্য 40 হাজার কোটি টাকা ! আচ্ছা, গোটা জঙ্গলটা স্ক্যাম করে নেওয়ার জন্য আরও বড় কোনও ঘোঁট নর্মদা-প্রকল্পকে মদত দিচ্ছে না তো ?

# বিষয় ঃ পরিবেশ

[ পরিবেশ নিয়ে যত লেখালেখি হচ্ছে, প্রশ্ন উঠছে তার চেয়েও বেশী। আর সেটাই স্বাভাবিক। প্রশ্নগুলোকে পাশ কাটানোর চেষ্টাই অস্বাভাবিক। অথচ তাই-ই ঘটছে। আমরা সেটা চাই না। তাই এই দপ্তর—বিষয় ঃ পরিবেশ।

দূষণের সমস্যার সমাধানের সূত্র বিজ্ঞান কারিগরীতে যতটা, ততটাই সমাজে, সংস্কৃতিতে। মানুষই কেন্দ্রবিন্দু। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর শেকড়টা এখানে, তারপর ছড়াক সে ডালপালা।

দপ্তর পরিচালনা সম্পাদনার দায়িত্বে থাকছেন একটি ছোট্ট দল। কিন্তু লিখতে পারেন সকলেই।

পরবর্তী সংখ্যায় আলোচ্য দূষণের রকম-সকম ও ক্ষয়ক্ষতি। কমবেশী এক হাজার শব্দে 30 সেপ্টেম্বরের মধ্যে লেখা পাঠান। এ বিষয়ে বা সংশ্লিষ্ট অন্য বিষয়ে ( দ্রঃ এপ্রিল-জুন '94 সংখ্যা ) মতামতও পাঠাতে পারেন পৃথকভাবে।—সঃ মঃ ]

বিষয় পরিবেশ ঃ দুই

## বিবর্তনের গতিপথে হস্তক্ষেপই কি দূষণের মূল কারণ ?

জীবাধার হবে বলে মাটি আর জল,
বাতাস ঝুলিয়ে দিল অক্সি-আঁচল,
ধরণী বিছিয়ে দিল কোমল বিছানা,
অরুণ ছড়ায় রাশি ফোটনের কণা।
প্রকৃতি মমতাময়ী পরম আদরে
চাঁদোয়া টাঙিয়ে দিল ওজোন-চাদরে।

পরিবেশ নিয়ে অরুণের ছোঁড়া নানা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমার প্রথমেই মনে পড়ল গগনদার কথা। সর্বদাই 'জ্ঞান দেবার' প্রবণতাকে পরিহাস করতেই বন্ধুদের কেউ তাঁকে এই নাম উপহার দিয়েছিল। এবং সেটাই চালু হয়ে গেছে। তাতে অবশ্য কিছুই পাল্টায়নি গগনদার। আমার মনে হল দূষণের ব্যাপারে একটা মৌলিক ধারণা পেতে গেলে গগনদা অতুলনীয়।—মানুষ তো যাত্রা শুরুর সময় থেকেই তার চারপাশটাকে পাল্টে চলেছে—সেটা তো এক হিসেবে যে কোনও জীবেরই ধর্ম। তাহলে পরিবেশ নিয়ে 'গেল গেল' রবই বা কেন উঠছে, আর কেনই বা মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে পরিবেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবার ? আমার প্রশ্ন শুনে গগনদা ছোটখাটো একটা লেকচারই দিয়ে ফেললেন ঃ জীবমণ্ডল,

বায়ুমণ্ডল, জলমণ্ডল আর শিলামণ্ডল—ওকি, চোখ অমন বড় করছো কেন ?—ও আচ্ছা, বাংলাতেই বলি—বায়োস্ফিয়ার, অ্যাটমোস্ফিয়ার, হাইড্রোস্ফিয়ার এবং লিথোস্ফিয়ার মিলে আজকের পৃথিবীর যে চেহারার সঙ্গে আমরা পরিচিত তার বয়স কতো জানো তো ? প্রায় ছ'শো কোটি বছর। সৌর মণ্ডলের উৎপত্তির সেই সুদূর লগ্নে পৃথিবী ছিল মহাজাগতিক গ্যাস আর ধুলোর এক ঘূর্ণিপিণ্ড-প্রচণ্ড গরম আর অস্থির। না ছিল তার কঠিন গুরু অভ্যন্তর, না ভূত্বক, না মাটি, না জল, না অক্সিজেন। কাজেই প্রশ্ন ছিল না কোনও জীবের অস্তিত্বের।

মাধ্যাকর্ষণে বাঁধা পড়া সেই ধুলো আর গ্যাসের অণুপরমাণুই যে নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হতে হতে আজকের অবস্থায় পৌঁছেছে তা কঠোরভাবে প্রমাণিত না হলেও নিছক অনুমানও নয়।

প্রায় দেড়শো কোটি বছর কেটে গেছিল পৃথিবীর কোর, ম্যান্টল আর ক্রাস্ট-এ বিন্যস্ত একটা রূপ পেতে। ক্রাস্ট অর্থাৎ ভূত্বক ছিল স্বভাবতই নীচের দুই স্তরের তুলনায় হাল্কা পদার্থ দিয়ে তৈরী। ঠাণ্ডা হবার পরে তা থেকে তৈরী হতে লাগল অ্যালুমিনিয়াম ও সিলিকনের নানা যৌগের কেলাস। এইসব কেলাস আবার জল, বৃষ্টি বাতাস, বিকীর্ণ সৌরশক্তি, তাপ, চাপ ইত্যাদির প্রভাবে কোথাও পরিণত হল নরম মাটিতে, কোথাও জমাট বাঁধল আগ্নেয় শিলায়, কোথাও তৈরী করল ধাতুর বা ধাতব যৌগের আস্তরণ।

ভূতাত্ত্বিক এই বিবর্তনের পাশাপাশি চলছিল আরও নানা বিবর্তন। মহাজাগতিক গ্যাসে ছিল হাইড্রোজেনের আধিপত্য। তাছাড়া, সক্রিয় বহুসংখ্যক আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত হত কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি, সঙ্গে নিয়ে প্রচুর তাপ। হাইড্রোজেনের সঙ্গে এদের বিক্রিয়ায় তৈরী হল হাইড্রোজেন অক্সাইড —জলীয় বাষ্প। কালক্রমে পৃথিবী আরও ঠাণ্ডা হলে তা জমে জলে পরিণত হতে লাগল। সূচনা হল জলমণ্ডলের। ভূত্বকের দ্রাব্য অংশ জলবাহিত হয়ে আশ্রয় পেতে থাকল সমুদ্রে।

মহাজাগতিক গ্যাসের মধ্যেকার অ্যামোনিয়া, মিথেন, হাইড্রোজেন এবং জলীয় বাষ্প পরস্পর বিক্রিয়ায় সম্ভবত তৈরী করেছিল প্রোটিনের উপাদান। প্রাকৃতিক বিদ্যুৎক্ষরণ, সৌরশক্তি ও তাপের প্রভাবেই এসব বিক্রিয়া সম্ভব হয়েছিল। এই গ্রহে প্রাণ সৃষ্টির উপাদান যে এভাবেই তৈরী হওয়া সম্ভব তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে এই শতকের মাঝামাঝি মিলার, ইউরে ( Miller, Urey ) প্রমুখ বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে। রাসায়নিক বিবর্তনের ধাপে ধাপে এইসব উপাদান থেকেই এসেছিল জৈব জটিল অণু-বায়ো-পলিমার। জৈব কোষ—যা এমনকি এককভাবেও এইসব বায়ো-পলিমার অণুর থেকে অনেক জটিল এক সংগঠন, তার সূত্রপাতও এই রাস্তা ধরেই। বিজ্ঞানীরা এর প্রাথমিক অবস্থার নাম দিয়েছেন 'প্রোটোসেল' —কালক্রমে যা এককোষী জীবে উত্তীর্ণ হয়েছে।

পৃথিবীর প্রথম এককোষী সজীব 'পদার্থ' সম্ভবত ছিল অবাতজীবি (অ্যান-এরোবিক)। কারণ, তখনও ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি গ্যাসে অক্সিজেন ছিল যৎসামান্যই। নানা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অক্সিজেন তৈরী হলেও তা অবিলম্বে শোষিত হয়ে যেতো। কিন্তু ক্রমে এমন সব জৈব প্রক্রিয়া ঘটতে লাগল যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অক্সিজেন উৎপাদন করতে পারল। 'বাতাসে' অক্সিজেনের অনুপাত বাড়তে লাগল। এবং একসময়ে দেখা দিল এমন অণুজীব যারা সালোকসংশ্লেষে সক্ষম। কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জল থেকে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে শর্করা ও অক্সিজেন যথেষ্ট পরিমাণে তৈরী হতে থাকল। জীবমণ্ডলের বিবর্তন হতে থাকল দ্রুততর। ক্রমে বাতাসের মূল উপাদান দাঁড়াল অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন এবং তাদের অনুপাতেও এল একটা ভারসাম্য। অক্সিজেনের পরিমাণ আয়তন হিসেবে

দাঁড়াল এক পঞ্চমাংশে।

বাতাসের আণবিক অক্সিজেন থেকে বিশেষ রকমের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কিছু অক্সিজেন রূপান্তরিত হলো ওজোনে—যার অণুতে দুটির বদলে অক্সিজেনের তিনটি পরমাণু আছে। ভূপৃষ্ঠের প্রায় 40 কি মি উপরে বেশ পাতলা একটি ওজোনস্তর ( 5-10 কি মি ) সৌরবিকিরণের অধিক শক্তিশালী অংশকে শুষে নিয়ে জীবকে দিল আরও সুরক্ষা এবং সুযোগ করে দিল দ্রুততর জৈব বিবর্তনের।

এইভাবে প্রায় 250-300 কোটি বছর পার করে পৃথিবী নামক গ্রহটি উপযোগী হলো জীব ধারণের।

জৈব বিবর্তনের সূত্র ধরে একসময় এলো মানুষের পূর্বসূরীরা মোটা-মুটি সাড়ে সাত লক্ষ বছর আগে। পৃথিবীর বয়সকে যদি ধরা যায় চব্বিশ ঘন্টা, তবে মানুষের অস্তিত্বের সময়-টুকু এক সেকেন্ডের সামান্য একটু বেশী মাত্র।

কিন্তু না, সাড়ে সাত লক্ষ বছর আগেকার অষ্ট্রালোপিথেকুসকে হয়তো মানুষ বলা ঠিক নয়, সঠিক অর্থে মানুষ বলা হয়তো সঙ্গত নয় পাঁচ লক্ষ বছর আগেকার পিথেকানথ্রোপুসকে বা এমনকি আশি হাজার বছর আগেকার নিয়ানডার্থাল মানুষকেও। আধুনিক মানুষ সে হিসেবে নিতান্তই অর্বাচীন ; বড় জোর দশ হাজার বছর আগে এশিয়া মাইনরে যার যাত্রা শুরু। এদেরকেই 'সভ্য' বলা যায়, কারণ এরা জানতো চাষ করতে এবং দলবদ্ধভাবে বাস করতে। তারপর···মানুষ জানতে বুঝতে চেয়েছে প্রকৃতিকে, সূচনা হয়েছে বিজ্ঞানের। আধুনিক বিজ্ঞানের বয়স মাত্র শ' পাঁচেক বছর। আর প্রকৃতিকে জয় করে সমৃদ্ধি ছিনিয়ে আনতে কলকারখানার নায়ক হিসেবে মানুষ দেখা দিয়েছে মাত্র শ' দুই বছর হল।

আমি আর থাকতে না পেরে বলে উঠলাম—উরেব্বাস্—ছ'শো কোটি বছরের ইতিহাস এমন এক নিঃশ্বাসে···

গগনদা আমায় আশ্বস্ত করার ভঙ্গীতে বললেন—হ্যাঁ, সুদীর্ঘ এই বিকাশের এই চকিত-বীক্ষণে হতচকিত করে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয় ; এ থেকে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারবে। প্রথমত, বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ ও বিভিন্ন ধারা যেন কেউ হিসেব করে মেপে মেপে সম্পন্ন করেছে যাতে জৈব বিবর্তনের পথে মানুষ আসতে পারে। কে যেন বলেছিলেন ঈশ্বরই শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ ? সেটা মানো আর নাই মানো, প্রকৃতিতে আংশিক ছন্দ উপেক্ষণীয় নয়। দ্বিতীয়ত, লক্ষ্য করবে, প্রথম দিকে পরিবর্তনের গতি ছিল মন্থর। আমি মানুষের অস্তিত্বের অনুকূলে পরিবেশের তৈরী হওয়ার নিরিখে বলছি। কিন্তু ক্রমশ তা দ্রুততর হয়েছে। এবং তৃতীয়ত, চারটি 'মণ্ডলের' বিবর্তনের এবং অস্তিত্বের গভীর ও জটিল আন্তঃসম্পর্ক ও পরস্পর নির্ভরতার ব্যাপারটাও এ থেকে বোঝা যায়। এই প্রেক্ষিতেই দেখতে হবে দূষণের সমস্যাকে। প্রশ্ন হল—ছ'শো কোটি বছর ধরে তিল তিল করে বিবর্তিত হয়ে আসা পৃথিবীকে কি মানুষ দু-এক শতক বা কয়েক দশকের মধ্যে অন্য পথে রূপান্তরিত হবার দিকে ঠেলে দিচ্ছে ?—যা স্পষ্টতই প্রাকৃতিক বিবর্তনের পথ নয় ? প্রকৃতির মধ্যে যে রাসায়নিক বিক্রিয়াদির ভারসাম্য—অর্থাৎ তার পেছনের যে রসায়ন, তা কি পাল্টে ফেলছে মানুষ ? আদিম পৃথিবীতে উচ্চ তাপ ও চাপে এবং উচ্চশক্তির বিকীরণ ইত্যাদির প্রভাবে রাসায়নিক পরিবর্তন সম্পন্ন হতো কিন্তু ক্রমশ প্রকৃতি সেগুলিকে বশে এনেছে, ধ্বংস করেছে বা লুকিয়ে ফেলেছে। জৈববিবর্তনের শেষ দিকে এসে আমরা দেখি, রাসায়নিক বিক্রিয়া বিশেষত জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া—সবই প্রায় ঘটছে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এবং বায়ুমণ্ডলীয় চাপেই। কিন্তু কলকারখানার কারিগর মানুষ আবার ব্যবহার করছে সেই সব পরিত্যক্ত পথ, হানছে প্রকৃতির উপর আক্রমণ, উন্মুক্ত করছে তেজস্ক্রিয়তার ভান্ডার, বিভিন্ন জৈব প্রজাতি লুপ্ত হবার কারণ ঘটাচ্ছে।

গগনদাকে মাটিতে নামিয়ে আনার চেষ্টা করি আমি—কিন্তু সাধারণ

মানুষের পক্ষে তো দূষণকে এভাবে বিচার করা সম্ভব নয়; আর 'মানুষ' বলে সকলকে এর দায়ভাগী করাটাও কি ঠিক?

গগনদা বিরক্ত হলেন না, বললেন—ঠিকই, সাধারণ মানুষ দূষণকে প্রত্যক্ষ করছে ব্যক্তি হিসেবেই, স্থানীয়ভাবেই। কিন্তু পরিবেশের মধ্যের সূক্ষ্ম ভারসাম্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষেরও একটা অনুভূতি আছে, হতে পারে তা একটু অন্যভাবে। আর সবাই দূষণ ঘটাচ্ছি না বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করাও ঠিক নয়, কারণ যত সামান্যই হোক, আমরা প্রায় সবাই 'সভ্যতার সম্পদ' কম বেশী ভোগ করছি, ভোগ করতে চাই আরও আরও বেশী করে, কাজেই দোষী আমরা সবাই। তবে লোভীদেরও নিবৃত্ত করতে হবে। তাছাড়া, অন্ধ হলেও প্রলয় বন্ধ থাকবে না। দূষণের কুফল কিন্তু সর্বব্যাপী।

আমি আরও একটু টান মারার চেষ্টা করি—তাহলে আমরা ধরতে পারি দূষণ ঘটছে প্রকৃতপক্ষে জীব-মণ্ডলের, বায়ু ও জলমণ্ডলের এবং শিলামণ্ডলের; এখন প্রশ্ন হল কিভাবে তা ঘটছে।

এবার গগনদা আমার উদ্দেশ্য খেয়াল করলেন, কেমন একটা বাঁকা হাসি দুলে উঠলো ওঁর ঠোঁটে, বললেন—স্থান-কালের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে 'মণ্ডল'কেই বা আর টানা কেন। সবার মতো বলতে পারো বায়ু-দূষণ, জল-দূষণ, মাটি-দূষণ; বলো গাছপালা, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ, ফসলের দূষণ, মানুষের খাদ্য-স্বাস্থ্যের দূষণ। অবশ্য তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু পটভূমিটা মনে রাখা ভালো।

—কিন্তু দূষণ কাদের বলবো?

আমার এ আব্দারে এবার গগনদা যেন একটু বিরক্তই হলেন—

—সেসব নিয়ে খুব ভালো সব 'কেতাব' আছে, দেখে নিতে পারো। কী মনে করে যোগ করলেন—আমি শুধু কয়েকটা কথা মনে রাখতে বলবো। বাহ্যত দূষণ পদার্থগুলি কঠিন কিংবা তরল কিংবা গ্যাসীয় এবং সেগুলি আমাদের কলকারখানা এবং নানা প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য। মানুষের দেহ কারখানা থেকেও কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় বর্জ্য প্রকৃতিতে মেশে কিন্তু সাধারণত প্রকৃতিতেই সেগুলির ক্ষতিকর প্রভাব বিনষ্ট হয়ে যায়। দূষণ পদার্থগুলি আবার মাটি-জল-বাতাসের ভৌতদূষণ, রাসায়নিকদূষণ এবং জৈবদূষণ ঘটাতে পারে। গন্ধ, রং, তাপমাত্রা, তেজস্ক্রিয়তা, শব্দ ইত্যাদি ঘটায় ভৌতদূষণ, নানারকম ভাসমান ও দ্রবীভূত জৈব বা অজৈব রাসায়নিক পদার্থ থেকে রাসায়নিক দূষণ এবং নানাধরনের জীবাণু—বিশেষত ক্ষতিকর বা রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু জৈবদূষণের প্রধান উপাদান। জল ও বাতাস নিজেরা যেমন দূষিত হয় তেমনি এরা আবার দূষণপদার্থের বাহকও বটে।

আমি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। গগনদা আমায় থামিয়ে দিলেন।—এরপর তুমি যা জানতে চাইবে, তা আমার জানা নেই; বিশেষজ্ঞের কাছে যাও আর স্পেশালিস্ট কেতাব কনসাল্ট করো।

'স্পেশালিস্টদের' একহাত নেবার সামান্য সুযোগও গগনদা হাতছাড়া করেন না। ওঁর মতে ব্যতিক্রমী দু একজন বাদে বিশেষজ্ঞরা বৃক্ষ দেখেন, অরণ্য সম্পর্কে তারা বিশেষ অজ্ঞই!

রবীন মজুমদার

# নর্ম্মদা আন্দোলনের বরোদা অফিসে ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ

[ নর্ম'দা উপত্যকার গ্রামগুলি আজ জলের নীচে তলিয়ে যাওয়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। দায়িত্বহীন ও ধ্বংসাত্মক 'উন্নয়নের' শিকার হতে চলেছেন আজ মধ্য ভারতের হাজারো গ্রামবাসী। অথচ এই নিপীড়িত নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধার জীবন বিনাশকারী 'নর্ম'দা প্রকল্প'র ভাল-মন্দ নিয়ে কথা বলার অধিকার, একে খতিয়ে দেখার অধিকারকেই আজ পেশী-শক্তি দিয়ে দাবিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শুধুই কি নর্ম'দা ? এই ছবি কি আমরা অন্যত্রও দেখি না ? ঘরের কাছে বজবজের পুজালিতে সি ই এস সি-র তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কি হচ্ছে ? এক দিকে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে খবরের কাগজে পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন, সর্বোচ্চ ক্ষমতাকে দিয়ে নিজের পক্ষে 'হ্যাঁ' বলিয়ে নেওয়া, অন্যদিকে নিরাপত্তা বাহিনীকে এলাকায় পাঠিয়ে দিয়ে ভয়ের আবহাওয়া তৈরী করা—এসব কি প্রকল্পের পক্ষে-বিপক্ষে সঠিক তথ্য দিয়ে সুস্থভাবে একে যাচাই করে দেখার সমার্থক ? এ প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ির 'সুন্দরবন ফার্টিলাইজার' কারখানার ঘটনাও আমরা মনে করতে পারি। তাই বরোদার ঘটনা কোনো বিক্ষিপ্ত উদাহরণ নয়—কাছে দূরে অনেক 'বরোদা'ই আজ ঘটছে। ]

চুরানব্বই সালের চব্বিশে মার্চ' তারিখটি গুজরাটের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষদের কাছে কলঙ্কজনক দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ওইদিন দুপুরে একদল লোক অতর্কিতে বরোদার 'নর্ম'দা বাঁচাও আন্দোলনে'র অফিসে হানা দেয় এবং অফিস ঘরের সমস্ত রেকর্ড'পত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশ বাহিনীর সামনেই। অথবা বলা ভাল পুলিশ পাহারায় ঘটেছে সব কিছু। উপস্থিত ছিল প্রেস ফটোগ্রাফাররাও। এই অভিযানে নেতৃত্ব দেয় একজন প্রাক্তন মেয়র—রাজেন্দ্র রাঠোর, একজন বিজেপি এম এল এ—নলীন ভাট, আর একজন কংগ্রেস কর্মী—যোগেশ আকোলকর।

ঘটনার সূত্রপাত এইভাবে। পনেরই মার্চ' পরিবেশমন্ত্রী শ্রীকমল নাথ একটি রিভিউ কমিটি গঠনের কথা ঘোষণা করেন—সর্দার সরোবর বাঁধের স্লুইস গেট বন্ধের ফলে নির্মজ্জিত গ্রামগুলির অবস্থা পর্যালোচনার জন্য। বস্তুতপক্ষে দিল্লীতে নর্ম'দা-আন্দোলনকারীদের চাপে পড়েই মন্ত্রী মহাশয়ের এই ঘোষণা। এতে গুজরাটের কংগ্রেস ও বিজেপি কর্মীরা বেজায় চটে যায়। তারা ঠিক করে কমিটির লোকজনকে এখানে কাজ করতে দেবে না। এবং তারা যে গুজরাটে অবাঞ্ছিত সেটা বোঝানোর জন্য কিছু লোক বরোদার বিমান বন্দরে অবস্থান শুরু করে। এরপর থেকে বিমান বন্দরে অবতরণকারী বেশ কিছু যাত্রীকে, হয় কমিটির লোক অথবা নর্ম'দা আন্দোলনের সমর্থক হিসেবে, অবস্থানকারীদের হাতে নানানভাবে লাঞ্ছিত হতে হয়, যাদের মধ্যে একজন স্বনামধন্য শিল্পীও

রয়েছেন।

বহু প্রতীক্ষার পরও রিভিউ কমিটির লোকজনের হদিশ তারা পায়না। এই অবস্থায় হঠাৎ উড়ো খবর আসে যে কমিটির লোকজন প্লেনে না এসে ট্রেনে এসেছেন এবং তাঁরা স্টেশন থেকে সরাসরি নর্মদা আন্দোলনের অফিসের দিকে রওনা হয়েছেন। এ খবর পেতেই জনা পনের অবস্থানকারী সেই অফিসে ধাওয়া করে। একটি পুলিশের জীপও তাদের সঙ্গী হয়। সেখানে পেঁাছে তারা কমিটির লোকজনের খোঁজ করে। অফিসের লোকজন ওই কমিটির এখানে আসা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। এবং কমিটি সেখানে আসেওনি। সে কথা জানালেও হামলাকারীরা তাতে নিরস্ত হয়না। ঘটনাচক্রে সেদিন ওই আন্দোলনের একজন নেত্রী শ্রীমতি মেধা পাটকর সেই অফিসেই তখন উপস্থিত ছিলেন। তিনিই তখন হামলাকারীদের রোষের শিকার হন। তারা দাবী করে মেধা পাটকরকে অবিলম্বে গুজরাট ত্যাগ করতে হবে। গুজরাটের কোনো ব্যাপারে তাঁর নাক গলানো তারা বরদাস্ত করবে না। নেহাৎ মহিলা বলেই তারা তাঁকে ভালয় ভালয় চলে যেতে দিচ্ছে। নতুবা —ইত্যাদি। (পরের দিন স্থানীয় সংবাদপত্রে হামলাকারীদের এই মহত্বের (!) বিবরণ বিশেষ ফলাও করে ছাপা হয়। এবং ঘটনাটি মহিলাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের গুজরাটি সংস্কৃতির নজির হিসেবে তুলে ধরা হয়!)

এরপর শুরু হয় হামলাকারীদের তাণ্ডব। অফিসের যাবতীয় ফাইল, কাগজ পত্র, ভিডিও ক্যাসেট, স্লাইড প্রজেক্টর, সিলিং-ফ্যান সবকিছু তিন তলার বারান্দা থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে নীচে রাস্তায় ফেলা হয়। নীচে দাঁড়ানো আরেকদল লোক সেগুলো জড়ো করে তাতে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। আশপাশের বাড়ীর বারান্দায় ও রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা হাজার খানেক লোক এই দৃশ্যের সাক্ষী। এছাড়াও সাক্ষী পুলিশ বাহিনী। এই বহুৎসবের আলোয় ডাণ্ডিয়া বাজারের আলোকিত পথটি কেমন লাগছে তা দেখতে ব্যস্ত ছিলেন সকলে। প্রতিবাদ করার কথা কারোর মনে আসেনি।

এই বীর পুঙ্গবেরা যাবার সময় শাসিয়ে যায় আবারও আসবে তারা। এবং এসেছিলও। ঠিক পরের দিনই। সকাল সাড়ে নটা নাগাদ। এবারে সংখ্যায় কিছু বেশী। জনা পঞ্চাশেক হবে। যথারীতি পুলিশ বাহিনীও হাজির ছিল। সাথে বি এস এফ জওয়ান। জনা পাঁচেক লোক তিনতলায় নর্মদা আন্দোলন অফিসে উঠে এসে মেধা পাটকরকে তক্ষুনি স্থান ত্যাগ করতে বলে। তাদের যুক্তি নীচে অপেক্ষমান জনতা এরপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে যাচ্ছেতাই কাণ্ড ঘটে যেতে পারে। নীচে তখন গালিগালাজ চীৎকার চেঁচামেচি চলছে।—এন বি এ বিদেশের দালাল, গুজরাটের শত্রু, ইত্যাদি। পুলিশও জানায় জনতাকে তারা সামলাতে পারবে না।—মনে রাখবেন, জনতা মানে—জনা পঞ্চাশেক লোক! তাদের ভয়ে পুলিশ অস্থির! অতএব আইন শৃংখলার স্বার্থে মেধা পাটকর সহ সবাইকে অফিস ত্যাগ করতে হবে। এই অবস্থায় নর্মদা আন্দোলনের কর্মীরা বাধ্য হয়ে তাঁদের অফিস ছেড়ে যান। এরপর থেকে কার্যত তাদের অফিসের দোরগোড়ায় একটি পুলিশ চৌকি বসে যায়। নর্মদা আন্দোলনের কর্মীরাও পুলিশের অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁদের অফিস ঘরে ঢুকতে পারছেন না।

গোটা ঘটনাটা গুজরাটের রাজনীতিতে একটা কুৎসিত ছাপ ফেলেছে। প্রত্যেক দলই চেষ্টা করছে (বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী চিমনভাই প্যাটেলের মৃত্যুর পর) সর্দার সরোবর প্রকল্পের পক্ষে গলা ফাটিয়ে নিজের পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে। ঘটনা হল যারা প্রকল্পের পক্ষে তাদের মত প্রকাশের সমান সুযোগ রয়েছে বিরোধীদের মতই। তাছাড়া সরকার তো তাদের পুরো মদত করছে। অথচ যুক্তিতে না পারলেই চলে আসছে গুণ্ডামি আর গা-জোয়ারি। 'বাঁধ চাই' কথাটাকে নিয়ে আসা হচ্ছে একটা উগ্র আবেগের জায়গায়। ফলে গণতান্ত্রিক আবহাওয়া নষ্ট হচ্ছে।

অভিযোগ করা হচ্ছে যে মেধা পাটকর একজন বহিরাগত এবং তাঁর গুজরাটের ব্যাপারে নাক গলানোর কোনো অধিকারই নেই। প্রশ্ন হল, কি দিয়ে ঠিক হবে যে গুজরাটি জনগণের হয়ে কথা বলার অধিকার কার? গুজরাটের আদিবাসী নারী-পুরুষ কি ধনী-চাষী বা শিল্পপতিদের সমান অধিকার পান? কে না জানে যে সৌরাষ্ট্রের মানুষ নিজেদের গুজরাটের থেকে আলাদা করে দেখেন? 'আলাদা হয়ে যাওয়ার চিন্তা' ভাল না মন্দ সে এক স্বতন্ত্র প্রশ্ন। কথাটা হল, প্রমাণ করার চেষ্টা হল যে গুজরাটের সামগ্রিক আওয়াজ হচ্ছে 'আমাদের বাঁধ (সর্দার সরোবর প্রকল্প) চাই—' এটাই গুজরাটের পরিচয়। অথচ গুজরাটি সমাজ তো নিটোল নয়, সেখানে ধনী-গরিব ফারাক আছে, জাত-পাত ভেদাভেদ আছে। এই জটিলতাকে এখানে অস্বীকার করা হচ্ছে।

গুজরাটের অনেক মানুষ আছেন যাঁরা মনে করেন যে সর্দার সরোবর প্রকল্প গুজরাটের জল সমস্যা সমাধান করতে পারবে না। অনেক গুজরাটি আছেন যাঁরা এর বিরোধিতা করছেন কারণ তাঁদের মত হল এতে তাঁদের ক্ষতি হবে। এঁদের আওয়াজ কি গুজরাটের আওয়াজ নয়?

'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনে'র কর্মীদের ওপর গুজরাটের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতার ছাপ লাগানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে 'যে বাঁধের বিরোধিতা করবে সে দেশদ্রোহী, গুজরাটের শত্রু'। এই স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাবটাই সবচেয়ে সাংঘাতিক এবং গুজরাটি না হলেই যে কেউ 'বহিরাগত' একথাটা বিপজ্জনক ভাবে মনে করিয়ে দিচ্ছে সেই ভয়ংকর প্রচার, যে কেউ সংখ্যালঘু হলেই সে বিদেশী।

এ প্রসঙ্গে গুজরাটি সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পর্কে অল্প কিছু বলা দরকার।

সংবাদপত্রের নিজস্ব মতামত থাকতেই পারে কিন্তু ঘটনা যা ঘটছে তার পরিবেশনে অন্তত একটা সততার ছাপ প্রত্যেকেই আশা করে। আশা করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে এই মাধ্যম প্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু যে ভাবে গুণ্ডামিকে তারা বীরত্বের নমুনা হিসেবে প্রচার করল, বাহবা দিল হামলাকারীদের পৌরুষকে—তা সত্যিই চিন্তার বিষয়। এটা নিশ্চিতভাবে দেখিয়ে দিল যে বাঁধের পক্ষে যে ক্ষমতা ভিত্তিক, পৌরুষবাদী, মারদাঙ্গার রাজনীতি রয়েছে তার সাথে সংবাদপত্র কিভাবে হাতে হাত মিলিয়ে চলছে। □

● এই মূল রিপোর্টটি বরোদা থেকে আমাদের বন্ধু বীণা শ্রীনিবাসন বি ও বি-র জন্য পাঠিয়েছেন। ইংরেজী থেকে ভাষান্তর করেছেন রবীন চক্রবর্তী।

WITH THE BEST

COMPLIMENTS FROM

LOKNATH ENTERPRISE

KADAMTALA, JALPAIGURI

# এইডস্, থাইল্যাণ্ড ও সংবাদমাধ্যম

বিশ্লেষণ

## I

1993 সালের 13 নভেম্বর কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় থাইল্যান্ডের এইডস্ সমস্যা ও তার প্রতিরোধ সম্পর্কে একটি লেখা প্রকাশিত হয়। লেখকের নাম সুঞ্জয় চৌধুরী। শিরোনাম ছিল 'ব্যাংকক্'স্ ড্যান্সিং ক্রুসেডার ফাইটস্ এইডস্' (ব্যাংককের নৃত্যরত ধর্ম-যোদ্ধা এইডস্-এর বিরুদ্ধে লড়ছেন)। লেখাটির সাথে তিনটি রঙিন ছবিও ছিল। নীচে রিপোর্টটির মূল বক্তব্য সংক্ষেপিতভাবে দেওয়া হল ঃ

ধোঁয়া আর আলোর ঝলকানির মধ্যে নেচে চলেছেন তিন নর্তকী। এমন সময় দুঃস্বপ্নের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ভয়ংকর মুখোশ পরা তিন দানব, এইডস্-এর প্রতীক। সেই দানবদের বিরুদ্ধে লড়তে এসে খতম হয়ে গেল এক মুষ্টিযোদ্ধা, এমন কি রুপালী পর্দার 'সুপার ম্যান'ও। আর তখনই স্টেজে এলেন এক বীর, নাচের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে দিলেন কিছু কন্ডোমের প্যাকেট। ব্যস, অশুভ এইডস্ দৈত্য খতম। হ্যাঁ, থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের অল্প-শিক্ষিত যৌন-শ্রমিক মেয়েদের সামনে এই বার্তাই তুলে ধরছেন এক নৃত্যশিল্পী 'নিরাপদ থাকুন, কন্ডোম ব্যবহার করুন'। এঁর নাম নাত্তি। তাঁর মতে যৌন ব্যবসা হল থাইল্যান্ডে এক একশ' কোটি বাহটের (বাহট্-থাইল্যান্ডের টাকা) ইন্ডাস্ট্রি, শুধু ব্যাংককের প্যাটপঙ রোডেই 50,000 মেয়ের ভীড়। কাছাকাছি 5000 ছেলে সমকামীও খদ্দেরের জন্য অপেক্ষা করে প্রত্যেক রাতে।

যদিও পশ্চিম ইউরোপ ও জাপান থেকে প্রতি বছর হাজারে হাজারে যৌন-পর্যটক 'প্যাকেজ ট্যুরে' আসছেন, তবুও খদ্দেরদের বেশীর ভাগই হল স্থানীয়। নাত্তির মতে, থাই সমাজে পুরুষরাই চরম কর্তৃত্ব করেন। অনেক বিবাহিত পুরুষও যৌনশ্রমিকদের কাছে যান। তাঁরা যদি কোনো বাঁধা উপপত্নী রাখেন তবে স্ত্রীদের কাছে সেটা একটা বড় বিপদ। তাই একটু 'এদিক-ওদিক' যাওয়াটায় বরং মহিলারা তুলনামূলকভাবে স্বস্তিতে থাকেন।

যৌন স্বেচ্ছাচারিতা আর 'প্যাকেজ ট্যুরের' জন্য আশি আর নব্বইয়ের দশকে যে দাম দিতে হচ্ছে থাইল্যান্ডকে তার নাম এইড্স। 6 কোটি লোকের দেশে এইচ আই ভি বহনকারীর সংখ্যা 5 লাখ।

নাত্তি তাই তৈরী করেছেন এক এইডস্ বিরোধী সংগঠন—ফ্যাক্ট'। পুরো নাম, ফ্ল্যাটারনিটি ফর এইডস্ সিজেশন ইন থাইল্যান্ড। ফ্যাক্ট থাইদের এইডস্ সম্পর্কে শিক্ষিত করছে, এইডস্ রোগীদের ব্যাপারে ভেদাভেদ কমানোর চেষ্টা করছে, পরামর্শ দিচ্ছে।

নাচ ও নাটকের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ফ্যাক্ট নিরাপদ যৌনতার কথা প্রচার করছে জোর গলায়। এবং সর্বোপরি গণিকালয়-গুলোতেও ঢুকে পড়ে ফ্যাক্ট কর্মীরা খদ্দেরদের সাথে কথা বলছেন, তাদের মধ্যে কন্ডোম বিলি করছেন, তাদের

সচেতন করছেন।

সরকারি সাহায্য না পেলে যে ফ্যাক্ট কিছুই করতে পারত না—এ ব্যাপারে নাত্তির স্বীকারোক্তি একেবারে পরিষ্কার। 'ছ বছর আগে সরকার আমাদের কাছে আসে, এবং আর্থিক সাহায্য, পুস্তিকা, লিফলেট আর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষ অর্থাৎ কন্ডোম দেয় বিনামূল্যে'। নাত্তির মতে, 'এইডস্ প্রতিরোধের ব্যাপারে আমাদের সরকার বিশ্বের সেরা দেশগুলোর একটা।'

দারিদ্র্য বহু মহিলাকে যৌনশ্রম-বৃত্তিতে নিয়ে আসে (বিশেষ করে গরীব এলাকা উত্তর থাইল্যান্ড থেকে)। অনেকেই তিন চার বছর ধরে দেহ বিক্রি করে কিছু টাকাকড়ি জমান এবং গ্রামে ফিরে যান। ফ্যাক্ট যৌন-শ্রমিকদের ফ্যাক্টকর্মী হিসেবে কাজ দিতে চায়। এইডস্ আক্রান্ত নারী ও পুরুষ যৌন-শ্রমিকদের যোগ্য কাজ খুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করে। তাঁদের 'এ জেড টি' বা এইড্সের অন্য ওষুধ কেনার জন্য টাকা দেয়। 'ভালবাসা, শুশ্রূষা এবং আধ্যাত্মিক সহযোগিতাই থাইল্যান্ডের মানুষকে এইডস্-এর আক্রমণ থেকে বাঁচাবে'—এই হল ফ্যাক্টের স্লোগান।

প্রথম দিকে বিরোধিতা ছিল প্রবল। একদিকে কন্ডোমের কথা তুললে মালিকরা খদ্দের কমে যাওয়ার সম্ভাবনায় খেপে যেত। অন্যদিকে এইডস্ বিরোধী প্রচারে টাকা দিতে কোনো কোম্পানীই রাজী ছিল না। ফ্যাক্ট কর্মীদের গুন্ডা দিয়ে পেটানোও হয়েছে এই সময়। তবে আস্তে আস্তে আন্তর্জাতিক চাপ এবং সরকারি সাহায্য স্রোতটা ঘুরিয়ে দিতে সাহায্য করেছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এখন ফ্যাক্টকে 'ফান্ড' দিচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও সক্রিয় সাহায্য করছে। স্কুলে, কলেজে প্রচারের সাফল্যের সাথে সাথে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে ফ্যাক্ট। এইডস্ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য শহরে অফিস করছে, টেলিফোনে তথ্য সরবরাহ করছে। আরও এগিয়ে যেতে চায় এই সংগঠন। যদিও এইডস্ বাড়ছে তবুও আশায় বুক বাঁধছেন নাত্তি ও তাঁর বন্ধুরা। তাঁদের আওয়াজ 'এক সাথে সবাই মিলে লড়ব, একসাথে সবাই মিলে সারিয়ে তুলব।'

## II

আমেরিকা থেকে প্রকাশিত একটি মাসিক পত্রিকার নাম 'জেড্ ম্যাগাজিন'। স্বাধীন রাজনৈতিক পত্রিকা জেড্ ম্যাগাজিন 'সুন্দর ভবিষ্যত' গড়ে তোলার লক্ষ্যে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদের সাহায্য করতে চায়। একই সাথে এই পত্রিকা বর্ণগত, নারী-পুরুষ ভেদাভেদগত বা শ্রেণীগত নিপীড়নের সমালোচনা গড়ে তোলে, যাতে পাঠকেরা চিন্তা করার একটা জায়গা পান। এই পত্রিকার সেপ্টেম্বর, 1993 সংখ্যায় 'থাইল্যান্ড ঃ ফ্রি মার্কেটস, এইডস্ এ্যান্ড চাইল্ড প্রস্টিটিউশান' (থাইল্যান্ড ঃ খোলা বাজার, এইডস্ ও শিশু যৌন-শ্রম) শীর্ষক একটি লেখা বেরোয়, লেখকের নাম—জেমস পেট্রাস্ এবং তিয়েনচাই ওয়ঙচাইসুওয়ান। নীচে লেখাটির কিছু অংশের বক্তব্য সংক্ষেপিত ভাবে দেওয়া হল ঃ

**যোগাযোগ ঃ**

'জেড্ ম্যাগাজিন', 116 সেন্ট বটল্ফ স্ট্রীট, বস্টন ; এম এ 02115-9979, ইউ এস এ।

### এইড্স্ চিত্র-থাইল্যাণ্ডে

থাইল্যাণ্ডে এইডস্ মহামারীর রূপ ধারণ করেছে এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। 1988 সালেই গবেষকরা দেখতে পান গোটা দেশের গণিকালয়ের যৌন-শ্রমিকদের শতকরা 17·3 অংশ এইচ আই ভি বহন করছেন। 1989 সালের জুন থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ব্যাঙ্ককের গণিকালয়গুলোতে এই সংক্রমণ এক লাফে 3 থেকে 20·4 শতাংশে পৌঁছে যায়। 1990 সালের এক হিসেবে গোটা দেশের শিশু যৌন-শ্রমিকদের 40 শতাংশ এইচ আই ভি আক্রান্ত বলে ধরে নেওয়া হয়, উত্তর থাইল্যাণ্ডের সমগ্র যৌন-শ্রমিকদের

ক্ষেত্রে সেটা ছিল 60 শতাংশ। 1993 সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই 6 লক্ষ থাইল্যাণ্ডবাসী এইড্‌স্‌ বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন এবং প্রত্যেক দিনই নতুন করে প্রচুর মানুষ অসুস্থ হচ্ছেন (উপরের দিকে সংখ্যাটা দৈনিক 1,200)। এই একই সময়ে 3,000 শিশু সংক্রমিত অবস্থায় জন্মেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) হিসেব করেছে যে 1997 সালের মধ্যে 125,000 থেকে 150,000 জন থাইল্যাণ্ডবাসী এইডস্‌-এ মারা যাবেন। দু হাজার সালের মধ্যে এইচ আই ভি পজিটিভ থাইদের সংখ্যা হবে 20 লক্ষ থেকে 60 লক্ষের মধ্যে। এই চরম ভয়ঙ্কর অবস্থার জন্য দায়ী কে এ প্রশ্নের উত্তরে অবশ্যই আঙুল দেখাতে হবে একটি ব্যবসার দিকে, যার নাম—যৌন পর্যটন।

## সবার ওপরে—যৌন পর্যটন

যদি প্রশ্ন করা হয় কোন শিল্প থাইল্যাণ্ডে সবচেয়ে বেশী বিদেশী মুদ্রা আয় করে? উত্তর হল—যৌন পর্যটন শিল্প। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এর থেকে বাৎসরিক আয় প্রায় 500 কোটি ডলারের কাছাকাছি। যেখানে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী টেক্সটাইল শিল্প দিচ্ছে 330 কোটি ডলার। 1990 সালের 1,000 কোটি ডলারের বাণিজ্য ঘাটতি এ শিল্প একাই প্রায় অর্ধেক পুষিয়ে দিয়েছিল 450 কোটি ডলার ঘরে এনে। কি ভাবে? আসলে থাইল্যাণ্ড হল যৌন-শ্রম বিক্রির এক বিশাল আন্তর্জাতিক বাজার। যৌন-শ্রম বিক্রিকে এখানে 'সেক্স ইণ্ডাস্ট্রি' বলা হয়, কারণ এ হল দেশের সবচেয়ে বড় শিল্প—কর্মীর সংখ্যার দিক থেকে। গোটা দেশের নারী শ্রমশক্তির 13 শতাংশ, সংখ্যায় কুড়ি লক্ষ যৌন-শ্রমিক আছেন এখানে। 16 বছরের নীচে যাঁদের বয়স সেই শিশু ও কিশোরী যৌন-শ্রমিকের সংখ্যা আট লক্ষ। যৌন পর্যটনের প্রধান পণ্য এঁরাই। এঁদের জন্যই ইউরোপ, আমেরিকা থেকে পর্যটনের নামে শুধু 1990 সালে থাইল্যাণ্ডে এসেছিল 50 লক্ষ (!) যৌন-শ্রম ক্রেতা। শুধু তাইই নয় এই মেয়েদের বিদেশেও পাঠানো হয়। শুধু 1988 সালেই দুই লক্ষ থাই যৌন-শ্রমিককে ইউরোপ পাঠানো হয়। এই আবহাওয়াতেই কিন্তু এইডস্‌ বাড়ছে।

## থাই-রাষ্ট্র কি করছে?

গোড়ার দিকে অবহেলা করলেও থাই শাসক শ্রেণী কিন্তু আজ এইডস নিয়ে চিন্তিত। তাই তারা 'নিরাপদ যৌন সম্পর্ক'র কথা বলছে। নীতি বানাচ্ছে। কিন্তু কেন? এটা কি থাই জনগণের প্রতি তাদের দায়িত্ব থেকে? না কি অন্য কারণ আছে?

## যৌন পর্যটন ঃ কার লাভ—কার ক্ষতি

ইন্দোচীন যুদ্ধের যুগেই থাইল্যাণ্ডে 'সেক্স ইণ্ডাস্ট্রি' বেড়ে ওঠে। 1967 সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সাথে থাই সরকার এক চুক্তি করে, যাতে ভিয়েতনাম যুদ্ধ-ক্লান্ত আমেরিকান সৈনিকরা থাইল্যাণ্ডে 'বিশ্রাম নিতে এবং আনন্দ-ফুর্তি করতে' আসতে পারে। 1974 সালের হিসেবে দেখা যায় নাইট ক্লাব বা গণিকালয়ের মত 'ফুর্তি' করার জায়গা দেশে গজিয়ে উঠেছে প্রায় 20,000। আর 4 লক্ষেরও বেশী মেয়ে চলে এসেছে বারবণিতার পেশায়। 1975 সালে বিশ্বব্যাঙ্ক পর্যটনের ভবিষ্যত সম্ভাবনা নিয়ে এক রিপোর্ট তৈরী করে। থাইল্যাণ্ডে পর্যটনের সাথে শিশু যৌন-শ্রমের যোগাযোগ বিশ্বব্যাঙ্কের অজানা ছিল না। এই সময়ই থাই সরকারও পরিষ্কারভাবে পর্যটনের নামে 'সেক্স-ইণ্ডাস্ট্রি'কে বাড়িয়ে তোলার নকশা তৈরী করে তার 'ট্যুরিজম' সংক্রান্ত জাতীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে। আর সেই থেকেই থাইল্যাণ্ডের যৌন-শ্রম ব্যবসা নতুন নতুন বাজার ধরছে। যৌন পর্যটনের থেকে কামিয়ে নিচ্ছে অঢেল মুনাফা।*

এই ব্যবস্থায় থাই সরকারের ভূমিকা খুবই বড়। কৃষি পণ্যের দামকে জোর করে কমিয়ে রেখে সে গ্রামীণ গরিব ও ছোট কৃষকের কোমর ভেঙে দেয়। ধারে ডুবে যাওয়ায় এবং জমি হারানোর ফলে এই সব কৃষকরা

* শিশু যৌনকর্মীরা গড়ে 12 থেকে 15 জন খদ্দেরকে প্রতিদিন সঙ্গ দেয়। মজুরী সপ্তাহে 80 সেণ্ট। সেখানে মালিক পায় প্রতি খরিদ্দারে 5 থেকে 20 ডলার। 100 সেণ্ট = 1 ডলার।

তাঁদের কন্যাসন্তানদের 'সেক্স ইন্ডাস্ট্রি'তে বেচে দিতে বাধ্য হন। বিশেষ করে উত্তর থাইল্যান্ডে এ এক ব্যাপক ঘটনা। এই সব দেহ শ্রমিকদের চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে রেখে খাটিয়ে নিয়ে লাভ করা হয় প্রচুর, যার ভাগ থেকে সরকারি কর্তাব্যক্তিরাও বাদ যান না। শুধু ব্যাংকক শহরেই থাই রাজনীতিবিদ, বড় ব্যবসায়ী, সেনাপতি ও নিরাপত্তা প্রধানদের মালিকানায় ম্যাসাজ ক্লিনিক আছে 800রও বেশী, নাইটক্লাব আছে 400, পুরুষ সমকামীদের বসার জায়গা আছে 55টা। হিসেব হল যে প্রত্যেকের জন্য 2,000 ডলার রোজগার করে মালিকরা কয়েক লক্ষ মেয়েকে বিদেশে পাঠিয়েছে। এই ধরণের টাকাতেই থাইল্যান্ডের অর্থনীতির চকচকে ভাব। তাই সরকার চিন্তিত এইডস্ যদি পর্যটক কমিয়ে দেয়, যদি ডলার আসা বন্ধ হয়ে যায়! এইখানেই তার স্বার্থ জড়িত।

## শেষের কথা

একদা বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্র থাইল্যান্ড আজ বিশ্ব যৌন নিপীড়ণের কেন্দ্র। এইড্সের ভয়ে বিদেশী ট্যুরিস্টরা ক্রমশই আরো ছোট 'পরিচ্ছন্ন' বাচ্চা চাইছে তাদের দৈহিক চাহিদা মেটানোর জন্য। তাই '90-এর দশকে এমন কি 6 বছরের বাচ্চাকেও (ছেলেরাও বাদ যায় না) যৌন-শ্রমিক হিসেবে খাটতে হচ্ছে। এইডস্ কিন্তু কমছে না।

তাই, থাই রাজনৈতিক কর্মীরা আজ আন্দোলন গড়ে তুলছেন এই ভয়াবহ শিশু যৌন-শ্রম প্রথার বিরুদ্ধে। আন্তর্জাতিক স্তরে সহায়তা চাইছেন বিভিন্ন মানবাধিকার গোষ্ঠী, নারী সংগঠন এবং অন্যান্য জায়গা থেকে, যাতে এই কুৎসিত ব্যবসার সাথে জড়িত সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে বয়কট করা যায়, একটা জোরালো ধাক্কা দেওয়া যায় সমস্ত ব্যবস্থাটাকে।

## III

ওপরের দুটি লেখাকে তুলনা করে দেখতে আমরা পাঠককে অনুরোধ করব। হিসেব অনুযায়ী গত ত্রিশ বছরে (1960-1990) থাই অর্থনীতির প্রকৃত বৃদ্ধি ঘটেছে 7 শতাংশ। বিশ্ব ব্যাংক বলছে যে খোলাবাজারী অর্থনীতির ফলেই এই 'চমক' সম্ভব হয়েছে। ব্যাংককের গণিকালয়ে নির্যাতিতা, এইডস্-আক্রান্ত, কৃষক কন্যার কান্না বিশ্বব্যাংক শুনেও শুনতে চায় না। থাই সরকার কিন্তু জানে যে যৌন শ্রমিকদের আখ মাড়াইয়ের কলে নিষ্পেষিত করেই তার এই 'সমৃদ্ধি'। 'এইডস্' তার বাড়া ভাতে ছাই দিতে পারে। তাই সে ও তার পশ্চিমী বন্ধুরা আজ এইডস্-এর বিরুদ্ধে সরব। লক্ষ্যণীয়, যে এইডস্ নিয়ে আমাদের দেশেও তো চলছে কত স্বাস্থ্য প্রকল্প। কত প্রচার, কত জনশিক্ষা। আমরা এগুলোর বিরোধীও নই। তবু একটা অস্বস্তি তো থেকেই যায়। এইরকম একটা সমস্যার সামাজিক, রাজনৈতিক কারণগুলো না খুঁজে বা সেগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই না করে শুধু 'নিরাপদ যৌনতা' প্রচার করতে কন্ডোম বিলোলেই কি প্রতিকার মিলবে? তাই আমাদের প্রশ্ন, যে গাছ পচে গেছে তার পাতায় মলম মাখানো না শিকড় উপড়ে ফেলা—কোনটা সঠিক পদক্ষেপ?

## IV

আমাদের শেষ প্রশ্ন বাজারী সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা সম্পর্কে। এটা কি আমাদের ওপর-ওপর ভাবতে শেখায় না?

ধরে নিচ্ছি টেলিগ্রাফের রিপোর্টটি সৎ ভাবেই রচিত। রঙিন ছবি, ঝরঝরে লেখা, আমরা তো মতামত তৈরী করে ফেলবই! অথচ এতে শিশু যৌন-শ্রমিকের নিদারুণ যন্ত্রণাও নেই, নেই নোংরা পথে থাই রাষ্ট্রের 'সম্পদ' বৃদ্ধির কথা। এই সীমাবদ্ধতা (না কি একপেশে মনোভাব?) কি প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার যোগ্য নয়?

**সংকলক**

# এইডস্ সম্ভাবনা—ভারতে

## আমরা কোথায় আছি ঃ

আমাদের ভারতবর্ষে 88 কোটি মানুষের মধ্যে 75 কোটি মানুষের স্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসের সুযোগ নেই। গড়ে 1100 জন পিছু চিকিৎসার জন্য একটি মাত্র শয্যা হাসপাতালে। গড়ে 2250 জন পিছু একজন ডাক্তার। 40 জন ডাক্তার পিছু 34 জন নার্স। স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করা হয় মোট জাতীয় আয়ের মাত্র 3·2%। (1)

একদিকে শহর ও শহরতলীতে হাজির নিত্য নতুন চিকিৎসা-প্রযুক্তি সি টি স্ক্যান, অটো অ্যানালাইজার, এম আর আই। অন্যদিকে ট্র্যাডিশনাল ভারতবর্ষ—88 কোটির মধ্যে চরম দারিদ্র্যে বাস করছে 42 কোটি মানুষ ; 22 কোটি মানুষ পরিশ্রুত পানীয় জল পায় না। 6 কোটি 90 লক্ষ শিশু অপুষ্টির শিকার। (2)

এরই মধ্যে 20শে মার্চ '94 কলকাতায় এইডস্ ও ড্রাগস্ এর নেশা প্রতিরোধ সংক্রান্ত আলোচনাচক্রে এক পরিসংখ্যানে জানা গেল এখন ভারতে এইচ আই ভি পজিটিভ মানুষের সংখ্যা সাড়ে সাত লক্ষ। এর মধ্যে দুই শতাধিক মানুষ আছে পশ্চিমবঙ্গে। (3)

কলকাতা ও শিলিগুড়িতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। (4)

সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে কলকাতার এক 'রেড লাইট এরিয়ায়' এইচ আই ভি পজিটিভ কেস বেড়েছে। 1992-এ ছিল 1·2%, 1993-এ বেড়ে হয়েছে 1·5%। (5)

## নতুন অর্থনীতির ধাক্কা ঃ

গ্লোবালাইজেসন, বিশ্ববাজার এইসব কথা দিয়ে ভবিষ্যতের মনোহারি ছবি আঁকতে আঁকতে ভারত সরকার কিছু কিছু সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল কৃষিকে শিল্প হিসেবে গণ্য করা। ফলে পুঁজি নির্ভর রপ্তানীমুখী কৃষি-পদ্ধতি ও প্রসেসিং চালু হবে। এমনিতেই তো গ্লোবালাইজেসেনের দৌলতে হাজির হচ্ছে 'উন্নততর' প্রযুক্তি। সব মিলিয়ে শ্রমিক নিয়োজন আগের থেকে কমে আসছে। উদ্বৃত্ত হচ্ছে পুরুষরাই। আর নারীদের অবস্থা তো শোচনীয়—নিরক্ষর 16 কোটি, বেশীর ভাগই গ্রামাঞ্চলের। কর্মরত মানুষদের মধ্যে মাত্র 16% নারী, তাও বেশীর ভাগই কাজ করেন অসংগঠিত ক্ষেত্রে। (6) তাই এই অবস্থায় থাইল্যাণ্ডের মত খোলবাজারী বাণিজ্যের দিশা গ্রহণ করলে অর্থনীতির উন্নতি কতটা হবে তা বলা যাচ্ছে না, তবে জীবিকার স্বাভাবিক পথগুলি ক্রমশ রুদ্ধ হয়ে গেলে গরীব পরিবারের শিশু ও নারীরা বাধ্য হবেন বেঁচে থাকার জন্যে যৌন-শ্রম বিক্রয়ের নতুন পথে পা বাড়াতে। এই পথেই গ্রাম উজাড় করে নেপাল থেকে ভারতে এসেছে দেড় লক্ষ মেয়ে। (7)

পাশাপাশি নতুন অর্থনীতি সরকারী হাসপাতালের দাক্ষিণ্যও বন্ধ করে দিতে বলছে, এই অবস্থায় এইডস্ হলে বাঁচাবে কে ?

## আমরা কোন দিকে চলেছি

সত্যি বলতে কি এই অবস্থায় লক্ষ লক্ষ স্বচ্ছল লোক ব্যক্তিগতভাবে

এইডস্ সম্পর্কে সচেতন হলেও ক্ষুধা, দারিদ্র্য অসহায়তা সম্বল করে আন্ত্রিক-জন্ডিস-অ্যানিমিয়া-ম্যালেরিয়া-কালা-জ্বর-আর্সেনিক সঙ্গে নিয়ে গ্রামে গঞ্জে বস্তিতে লক্ষ লক্ষ পরিবারে বছরের পর বছর টিঁকে থাকা মানুষদের জন্য মানুষের মত বেঁচে থাকার উপযুক্ত জীবন পরিবেশ যতদিন অমানবিক থেকে যাবে ততদিন এইডস্ তো বহুদূর আন্ত্রিকের বিরুদ্ধেই প্রতিরোধ গড়ে তুলবার সক্ষমতা অর্জন করা স্বপ্নই থেকে যাবে আমাদের জাগরণে। তাই, স্বাস্থ্য পরিবেশের সর্বাঙ্গীন অসুস্থতার মধ্যে যেখানে আজ আন্ত্রিকের বিরুদ্ধে মানুষকে সামিল করা যাচ্ছে না সেখানে বিনোদন কেন্দ্রে নিযুক্ত শিশু ও নারী-দের এইডস্-এর বিভিন্ন খরচাবহুল চিকিৎসা করানোর জন্য র‍্যাকেটগুলির প্রভাবশালী মধ্যমণিদের বাধ্য করা সোনার পাথরবাটি বানানোর থেকেও কঠিন থেকে যাবে। আর এইডস্ আক্রান্ত মানুষদের চিকিৎসা-সংক্রান্ত তথ্যাদি নগণ্য সমাজমনস্ক ব্যক্তি ও সংগঠন সংগ্রহ করবে, নিজেদের মধ্যেই বিশ্লেষণ করবে —ভাবনাটা ভাবনাই থেকে যাবে। এভাবেই আজকের থাইল্যান্ডের অবস্থায় পৌঁছে যাবো আমরাও। এইডস্-এর চেইন রিয়াকশন ঠেকানোর উপায় থাকবে না। তখন এই আত্মঘাতী চলার গহ্বর থেকে রেহাই পাবো না আমরাও; যতই আজ বলি না অতটা ভয়ের কিছু নেই। আর তাই পণ্যবাজারী উন্নতির চেইন রিয়াকশনের পরিণতিতে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জীবনে জেনোসাইড অবশ্যম্ভাবী। এভাবেই ভারতীয় উপমহাদেশের ভবিষ্যতকে আমাদের আজকের প্রতিদিনের উদাসীনতার মাশুল বহন করতে হবে।

□ প্রদীপ দত্ত


সূত্র ঃ

1. মানব উন্নয়ন সূচক, মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত রিপোর্ট 1993, রাষ্ট্রসঙ্ঘ
2. ঐ
3. আজকাল 21.3.1993
4. যুগান্তর 9.4.1993
5. আজকাল 5.5.1994
6. ড্রাফট্ ন্যাশনাল পারস্পেকটিভ প্ল্যানস ফর উইমেন 1988 (2000 এ ডি)
7. আনন্দবাজার 26.6.1994

# নির্মাণকর্মীরা আজও অসংগঠিত

চারপাশে যা দেখেছি : এক

এতদিন কাগজেপত্রে পড়েছি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। সম্প্রতি সে অভিজ্ঞতা হল। বাড়ী ঘরদোর বানায় যে মিস্ত্রি-মজুররা তাদের অবস্থা একটু কাছ থেকে দেখার সুযোগ হল। মজুরীর তুলনায় বেশী শ্রম তো আছেই। এ ছাড়াও আছে এমন সব ফ্যাঁকড়া যা কারো নজরেই আসে না।

কলকাতার পাশেই গড়ে উঠেছে নতুন এক শহর।—সল্টলেক সিটি। সুপরিকল্পিত শহর বলে নামডাক। বিশাল বিশাল অফিসবাড়ী ও সুন্দর সুন্দর বসত বাড়ীতে ছেয়ে গেছে। এখনও চলছে কাজ। হাজার হাজার মিস্ত্রি-মজুর কাজ করেছেন এখানে। এখনও করছেন। যাদের অনেকেই এই সল্টলেকেই থাকেন—নির্মীয়মান বাড়ীর পাশে ছাউনি করে, গ্যারেজ-ঘরে, পার্কে কিংবা ফাঁকা প্লটে ঝুপ্‌ড়ি বানিয়ে যাহোক করে মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করে নিয়েছেন এরা। ব্যস্ এইটুকুই। আর কোনও বন্দোবস্ত নেই। নেই পানের জল অথবা শৌচাগার। ফলে কাজ সারতে হয় যত্রতত্র। এদের অনেকেই ছেলেমেয়ে পরিবার নিয়েই থাকেন।

এতবড় একটা শহর গড়া হবে—জানা কথা হাজার হাজার শ্রমিক মজুর কাজ করবে। থাকবে এসে। পরিকল্পনাকারেরা জানতেন সে কথা। অথচ এই মানুষগুলোর কথা ভেবে সামান্য কয়েকটা সাধারণ স্নানাগার এবং শৌচাগার করা যেত না কি ?—ছেড়েই দিলাম শ্রমিক-মজুরদের কথা। নিত্য পথচারীদের গলা শুকিয়ে কাঠ হলেও এক ফোঁটা পানের জল পাবেন না শহরের পথ ঢুঁড়ে কোথাও। চোখে পড়ে না কোনও টিউবওয়েল কিংবা অন্য কোনও জলের ব্যবস্থা। নিছক টাকার অভাবেই হয়নি এসব ?—মনে হয় না। অন্তত সল্টলেক শহর কর্তৃপক্ষের গুটিকয়েক অফিস ঘুরে মনে হয়নি সেকথা। কিছু কিছু উচ্চপদস্থ কর্মচারীর ঘরের কার্পেট এবং পর্দার বাহার দেখে পয়সার অভাব আছে মনে হয়নি।

এখানে পুলিশী হুজ্জুতের লক্ষ্যও ওই মজুর-শ্রমিকরা। সল্টলেকে কাজ করতে আসা মিস্ত্রি-মজুরদের বড় হেনস্থা করে এখানকার পুলিশ। নানান অছিলায় তুলে নিয়ে যায় থানায়। তারপর মারধোর তো আছেই। এরপর বিনা দক্ষিণায় ছাড়া পাওয়ার উপায় নেই। দক্ষিণা এরা দিয়েও দেন। কারণ তা না'লে বাঁধা-কাজ হারাবেন, রোজ কাটা যাবে। একজন মিস্ত্রির সাথে আলাপ হল। বেশ দক্ষ মিস্ত্রি। তবে শরীরে নানান অসুবিধে নিয়ে কাজ করেন। জানতে পারলাম পুলিশী নির্যাতনে ওঁর এই অবস্থা। তিনি ওই শহরেরই একজন নামী কনসালটেন্ট-ঠিকেদারের কাছে কাজ করতেন। কাজ ছেড়ে দেওয়াতেই নাকি এই বিপত্তি!

সল্টলেক কতটুকু আর শহর ? খুবই ছোট্ট। তাও এই পশ্চিমবঙ্গে। গোটা দেশে তাহলে কি হচ্ছে অনুমান করতে ভয় হয়। অথচ উন্নয়নকার্যের প্রাথমিক প্রস্তুতির কাজটাই করছেন

এই নির্মাণকর্মীরা।—ঘরদোর, অফিস-বাড়ী, কলকারখানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র, বাঁধ, ব্রীজ, রাস্তা—এদের শ্রমেই হচ্ছে।—সবার অলক্ষ্যে। অথচ এতটুকু নিরাপত্তা নেই এদের—কাজের অথবা জীবনের। অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেন যখন উঁচু উঁচু বাড়ী কিংবা অন্যান্য স্ট্রাকচার তৈরী করেন। মাচা থেকে পড়ে মৃত্যু কিংবা পঙ্গু হওয়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটে। কিন্তু ক্ষতিপূরণের কোনও ব্যবস্থা নেই। কে দেবে ক্ষতিপূরণ? দেশের নব্বই শতাংশ নির্মাণ কাজ হয় ঠিকাদারদের দিয়ে।—ক্ষতিপূরণ চুলোয় যাক ওদের কাছে মানুষ হিসেবে সামান্য মর্যাদাটুকুও মেলেনা কোথাও।

ক্ষতিপূরণ ছাড়াও সাধারণ প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাটুকুও থাকেনা প্রায় কোথাওই। সিমেন্ট, বালি, পাথর, লোহা, বাঁশ, পেরেক নিয়ে কাজ। দুর্ঘটনা আকছার ঘটছে। তাছাড়া আছে পেশাগত নানান ব্যাধি ও অসুস্থতা। প্রতিকারের কোনও ব্যবস্থা নেই। বিনা প্রতিবাদে চলছে এই অবিচার। কোনরকম দাবী দাওয়ার আওয়াজও শোনা যায়না কোনখান থেকে।

নিজেরা দাবী তুলবেন?—সে অবস্থায় নেই এঁরা। কারণ বেগরবাই করলেই কাজ থেকে বসে যেতে হবে। ফলে কে নেবে সে ঝুঁকি? □

র চ

# মফস্বলের চালচিত্র

## একদিনের অভিজ্ঞতায়

চারপাশে যা দেখেছি ঃ দুই

চওড়া পিচের রাস্তা চলে গেছে বাংলাদেশ সীমান্তর দিকে, দু পাশেই দোকান-বাজার। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় এক্সপ্রেস বাস ছুটে যাচ্ছে কলকাতা বসিরহাট, দু দিকেই। জায়গাটার নাম স্বরূপনগর বাজার, ব্লক-বসিরহাট দু নম্বর। কথা হচ্ছিল স্থানীয় মানুষজনের সাথে, চায়ের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে। একটু আগেই ছুটন্ত বাসের জানালা দিয়ে দেখতে পেয়েছিলাম কাঁঠালের হাট। ছোট ছোট ভ্যান, টেম্পোয় কাঁঠাল তোলা হচ্ছে। প্রশ্ন করতে মুচকি হাসলেন এরফান আলী, স্থানীয় কৃষক। 'হ্যাঁ, এখান থেকে ফল, সব্জী অনেক জায়গায় যাচ্ছে। এখানকার ডাব আপনি দিল্লীতেও পেতে পারেন। আর মাছ তো যাচ্ছে বর্ধমানের বাজারেও'।—'আসলে এই অঞ্চলে ধান বা পাটের পাশাপাশি মাছ একটা বড় জায়গা নিয়ে আছে' স্মৃতিচারণ করার ভঙ্গিতে জানাচ্ছিলেন আর একজন। এসব এলাকায় দ্বিতীয় ভূমি-সংস্কার আইনের যুগে খাসজমি দখলের আন্দোলন খুবই হয়েছিল। বিস্তীর্ণ জলাভূমি (ওয়েটল্যান্ড)-এর মালিকানা স্থানীয় সাধারণ মানুষের পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোর্ট, মামলা, নানান ঝামেলায় এইসব জমির হাত বদল ঠিকভাবে হতে পারেনি। স্থানীয় কৃষক সমিতিই (না পঞ্চায়েত?) এখন এই জলা লীজ দেয়। এবং সেই টাকা গ্রামে ভাগ করে দেয়। এক একটা জলা 100 বিঘে, 200 বিঘে এমন কি 500 বিঘেও হয়। লীজের হার গড়ে 10,000 টাকা প্রতি বিঘে। লীজ পাওয়ার জন্য নীলাম হয়। এদিক ওদিকও হয়। কিছু রইস আদমিই লীজ পায় এমন অভিযোগও

আছে। টাকা ভাগ করে দেওয়ার ব্যাপার থেকে জমিতে জল ঢোকানো অবধি সব কিছুতেই গন্ধ আছে পক্ষপাতিত্বের আর দুর্নীতির। এখানেই শেষ নয়, এরপর আছে কাঁটায় মাছ পাঠানো। আড়তদার টাকা লগ্নী করে; তার মস্তান আছে, তাই বিক্রিও তারই হাতের মুঠোয়। এখানেও শেষ নয়। এরপর ড্রেস করে বরফ মেরে মাছ চলে যায় শহরে। এই চেনের বাইরে কিছু করতে গেলে রেট পাওয়া যাবে না। ইদানীং কদম্বগাছিতে 'সী-ফুড এক্সপোর্টারস' অফিস খুলেছে। তাদের ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা আছে। 'এক্সপোর্ট' মানেই তো চিংড়ি। এখানে নিকাশী খালে নোনা জলে চিংড়ি চাষ হচ্ছে। কেউ কেউ বললেন বাগদা চাষ বেআইনী ভাবেই শুরু হয়েছিল। বাগদার পোনা নদী থেকে ধরা হয়। দাম হাজার প্রতি সাতশ টাকা। সাম্প্রতিককালে উড়িষ্যার চিলিকা থেকেও আসছে। এই নিকাশী খালে চিংড়ি চাষের জন্য জল নিকাশের খুব ক্ষতি হচ্ছে। জলের মানচিত্রটা অনেকটা এরকম। হাড়োয়া গাঙ থেকে বিদ্যাধরী। বিদ্যাধরী থেকে ইছামতী। হাড়োয়া গাঙ খরচার খাতায়। বিদ্যাধরীরও অবস্থা তথৈবচ। যদিও বারাসাতে বিদ্যাধরী সংস্কারের আলাদা বিভাগ আছে। এই বিভাগের নিজস্ব বাড়ী আছে। নাম বিদ্যাধরী ভবন। কী কাজ, কেউই ভাল বলতে পারলেন না। অথচ নিকাশী ব্যবস্থা জোরদার না করলে বারাসাত থেকে আমডাঙা ডোবার সম্ভাবনা আছে। এখনই দত্তপুকুর থেকে গুমা রেললাইনের ডান দিক (বনগাঁর দিকে মুখ করে দাঁড়ালে) জলে ডুবে থাকছে। এক ফসলের বেশী হচ্ছে না।

শুধু চিংড়িই নয়, এখন কাঁকড়াও বিদেশে যাচ্ছে। বিশেষ করে 150 থেকে 200 গ্রামের মাদী কাঁকড়ার নাকি বাইরে খুবই চাহিদা। মাদী নাকি একটু লালচে হয়। মদ্দাগুলো কালচে, স্থানীয় কোনো বাজারেই নাকি এখন এদের আর দেখা পাওয়া যাবে না। 'বেধড়ক মাদীগুলোকে তুলে নিয়ে গেলে তো কাঁকড়া শেষও হয়ে যেতে পারে'—হাওয়ায় প্রশ্ন ছুঁড়লাম। না, এদিকটা কেউ ততো জানেন না। তবে ব্যবসার মালিকরা নিশ্চয়ই বোঝেন! হাঁস ও সোনার ডিম গল্পটা তো তাঁদের অজানা নয়। 'বাগদা, কাঁকড়া ছাড়ুন, তেলাপিয়াও জাতে উঠে গেল জানেন।' 'মানে তেলাপিয়াও কি বাইরে যাবে?' 'হ্যাঁ, অলরেডি পাইকারি দর ফেলা হয়েছে 50 টাকা প্রতি কেজি, 100 গ্রামের ওপরের সাইজের জন্য।' কদিন বাদে ওরাও হাপিস হয়ে যাবে।

এত কিছু যে হচ্ছে এতে স্থানীয় মানুষের লাভ কতটুকু? প্রচুর পয়সা ছাড়া এই ধরণের বিশেষ জলচর জীবের ব্যবসা করা যায় না, তাই বাইরের টাকা আসছে, লাভও শহুরে মালিকের। অন্য দিকে নদী, জলা জমি, জল নিকাশী খাল এগুলোকে দ্রুত পয়সা কামানোর জন্য উল্টো-পাল্টা ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তার দামও কিন্তু চরমভাবে দিতে হবে স্থানীয় মানুষকেই!

এই সব অঞ্চল 500–700 বছরের পুরোন জায়গা। হাড়োয়ায় তাম্রলিপ্তর সময়ে বৌদ্ধ বিহার ছিল। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ থেকে মুসলিম হন প্রচুর মানুষ। 24 পরগণার দুই পরগণা বালিয়া এবং বালান্দা এদিকেই বলে অনুমান করা যায়। আজকের বড় রাস্তা বরাবর এক সময় মার্টিন রেলওয়ের লাইন ছিল। তাই বোধহয় রাস্তার ধারে ধারে গ্রাম, পেছনে মাঠ। পশ্চিম বাংলায় সাধারণত রাস্তার পরে মাঠ ও তার পেছনে গ্রাম চোখে পড়ে। শহরে যাওয়ার জন্য এই বড় রাস্তার ওপরই মানুষ বেশী ভরসা করেন। তাঁদের অভিযোগ বারাসাত-হাসনাবাদ রেল লাইনকে নাকি নিয়ে যাওয়া হয়েছে জনবসতির থেকে দূরে নীচু জমির মধ্য দিয়ে!

এসব অঞ্চলে চাষ-বাস ভালই হয়, পাটের তো সুনাম আছেই গুণমানের দিক দিয়ে। কিন্তু, পাটচাষী ন্যায্য দাম পাচ্ছে কই? এলাকার প্রায় 40 শতাংশ মানুষের জমি নেই। এঁরা মজুরি নিয়ে অন্যের ক্ষেতে কাজ করেন। মজুরি—দু বেলা কাজ করলে 30 টাকা, একবার খাওয়া। এর ওপরে

বিড়ি, জলপান আছে। সময়—সকাল 6টা থেকে 12টা, বিকেল 3টে থেকে 6টা।

তবে, সব সময়ই কাজ থাকে না, তখন দিনে তিনবার খাওয়াকে একবার করতে হয়, হয়ত জোটে শুধু ভাত আর কাঁচালঙ্কা। এর ওপরেও ভাগ বসাচ্ছে শহরের বন্ধ কারখানার শ্রমিক, আর বাংলাদেশ থেকে কাজ খুঁজতে আসা মানুষ। বাংলাদেশীরা কম পয়সায় কাজ করতে রাজী আছেন, খাওয়াও চান না। সীজনে সর্দাররাও (আদিবাসী) আসেন, এঁদের অবশ্য স্থানীয় মানুষের হারেই মজুরি দিতে হয়। আদিবাসী মহিলাদের কাজের সুনাম আছে, বিশেষত রোয়ার ক্ষেত্রে। স্থানীয় মহিলারা (অধিকাংশই মুসলিম) ক্ষেতের কাজ করেন না। এক বিশেষ জাতের মুসলিম মেয়েরা অবশ্য এর ব্যতিক্রম। এই জাতের পুরুষরা মাছ ধরেন।

তবে কাজের চেষ্টা তো সবাইকেই করতে হচ্ছে। জমির ওপর চাপ হু হু করে বাড়ছে। এক এক জন দুতিন রকম ধান্দা করতে বাধ্য হচ্ছে। গরীবদের চেষ্টা—যদি বিড়ি বাঁধা বা ভ্যান চালানোর কাজ পাওয়া যায়। কৃষক ঘরের মহিলারা ঘরে বসে ফুলের কাজ (এমব্রয়ডারি) করছেন। পাটের দড়িও তৈরী করছেন। প্রচুর ছেলে কলকাতায়, শহরের আশেপাশে ছোটখাটো কাজ করছেন, সব্জী নিয়ে যাচ্ছেন। তবে মূলত দর্জির কাজ আর ফুলের কাজ করতে এখানকার ছেলেরা মেটিয়াবুরুজ থেকে শুরু করে গৌহাটি, দিল্লি অবধি যাচ্ছেন।

ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম, এত চমৎকার জমি, এত মাছ, সবুজ মাঠ-ঘাট ছেড়ে যাঁরা দিল্লীর নোংরা ঘিঞ্জি, শুকনো গরমে তাদের জীবনের দিন রাতগুলো নিংড়ে দিচ্ছেন কটা কাঁচা পয়সার জন্য, কত দাম তাঁদের দিতে হচ্ছে—কে জানে? □

—পরিদর্শক

# স্বাস্থ্য ও পরিবেশ

## চটকল শ্রমিক এলাকায়

**চারপাশে যা দেখেছি ঃ তিন**

মল-মূত্র (পরীক্ষার জন্য নয়), পচা-জঞ্জাল, এসবের বায়বীয় অণুতে ভরা বাতাস—ব্যস; আর কিছু না লিখে শুধু এই শব্দগুলো দিয়ে পুরো লেখাটা ভরিয়ে দিলেও কুলি-লাইনের সৌন্দর্যের পুরোপুরি বর্ণনা হয়ে উঠবে না! 'বাবুদের বাড়ীর সামনেও জঞ্জাল থাকে'—আপনি বলতে পারেন, সে তর্ক থাক আপাতত। এই ফাঁকে খবরের কাগজের মালিকদের একটা সুসংবাদ দিয়ে রাখি। না খেতে পাওয়া হাড়-জিরজিরে মানুষের ছবি তুলতে ফটোগ্রাফারকে সোমালিয়ায় বা রোয়ান্ডায় পাঠানোর দরকার নেই—রাজাবাগান কুলিলাইনে পাঠিয়ে দিন, অল্প খরচ, কয়েকটা ওরকম ছবি অনায়াসে তুলতে পারবেন। দক্ষিণেশ্বর স্টেশন থেকে লাইন ধরে বরানগরের দিকে একটুখানি হাঁটুন—ঘেস আর মাঝে মাঝে বড় বড় গর্ত (যার মধ্যে ভেঙে পড়া চাঁইয়ের নীচে চাপা পড়ে কেউ কেউ 'খবর' হয় কখনো কখনো)। আর, আর একটু এগোলেই মরা গরু বা মোষের শব ঘিরে শকুনদের ভুরিভোজ।

পাশেই জলা—স্নান, কাপড় ধোয়া হয় তাতে ; এই জল অবশ্য কেউ খায় না, প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরের ট্যাপ থেকে খাবার জল নিয়ে আসে সবাই। রেল লাইনটা এখানে ছোটখাটো টিলার সমান উঁচু ; জল আনতে সেটা পেরোতে হয়, সবসময়েই কলটাতে লাইন থাকে। এতখানি 'প্রাকৃতিক' বর্ণনা দিতে হল কারণ গত বছর এখানে কুড়িজন আন্ত্রিকে মারা গেছেন। এবার এখনো শুরু হয়নি, হলে স্বাস্থ্য দপ্তরের করার কিছু থাকবে না।

আপনার আমার থাকবার জায়গাকে বাড়ী, ফ্ল্যাট বা অ্যাপার্টমেন্ট বলা হয়—শ্রমিকদের থাকবার জায়গার নাম 'কুলি লাইন'—প্রায় 'লাইন'-এর মতোই প্রশস্ত সেগুলো! রাজাবাগান-লাইন হল বরানগর জুটমিলের কুলি লাইন। দশ-বারো বছর আগে এখানকার বিদ্যুতের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে, আলোর সাথে সাথে জলও গ্যাছে। ট্যাপগুলোর চিহ্নও এখন আর নেই। ঘরগুলোর সামনে দিয়ে ড্রেন ছিল, এখন সেগুলোর অস্তিত্ব খুঁজতে গেলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চালাতে হবে। পায়খানার ট্যাংকগুলো তাদের পেট-বোঝাই হওয়ার খবর জানিয়েছে অনেক বছর, তাই ছেলেমেয়ে সবাইকে ও-কাজ সারতে ঐ মরা গরু আর শকুনের ডোবার কাছে যেতে হয়। বিদ্যুতের লাইন কাটার গল্পটাও যুক্তিপূর্ণ (বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির যুগে যুক্তি ছাড়া মানুষ এক পাও চলতে পারে না)! কুলি লাইন ঘিরে বস্তি গড়ে উঠছিল, তারা বিদ্যুৎ ট্যাপ করে, প্রচুর চার্জ ওঠে, মালিক চার্জ দিতে অস্বীকার করে—ব্যস লাইন কেটে দেওয়া হল, তারপর থেকে দশ-বারো বছর যেন চুপিসারে কেটে গেছে। অবশ্য মানুষের (দাদাদের) কর্মোদ্যম থেমে নেই। পাশেই একটা বিরাট জলায় মাছ চাষ হয়, বস্তিটাতে ঘর ওঠে আর সেগুলো নাকি ভাড়া দেওয়া হয়। বাংলা বা চুল্লুর ঠেক তৈরী হয়, আর ওপরওলাদের এইসব কাজের সাথে তাল মিলিয়ে যেখানে সেখানে জমতে থাকে আবর্জনা, বারান্দা ডুবিয়ে নোংরা জল ঢুকতে থাকে ঘরে, পা বাঁচিয়ে চলার জন্যে একটা-দুটো ইঁট পাততে হয়। ন-মাসে ছ-মাসে একবার চুন ছিটিয়ে দিয়ে যায় মিউনিসি-প্যালিটি (এখানকার বাসিন্দাদের আবার ভোটার লিস্টে নামও আছে, হয়ত সেজন্যেই!)।

বরানগর জুট মিল'-এর অন্য একটা শ্রমিক বস্তি 'ফেরিঘাট কুলি-লাইন'। জুটমিল লক আউট হওয়ার পর থেকে এখানেও বিদ্যুৎ এবং জল বন্ধ। নিশ্চয়ই জঞ্জালের বর্ণনা আপনারও আর শোনার ইচ্ছে নেই—সেই একই গন্ধ, একই দৃশ্য, শুধু নতুন হয়েছে বলে এখানকার বাসিন্দারা মাঝে মাঝে (হয়ত 15 দিনে একবার) চাঁদা তুলে সুইপার ডেকে সাফ করান। 'মাঝে মাঝে' কথাটা বুঝতে হলে ভাবুন—একটুও জল নেই, আর শুধুমাত্র একদিন পায়খানায় জল না দিয়ে বাড়ীতে থাকুন। একটা বাঁচোয়া, লোকেরা অনেকেই দেশের বাড়ী চলে গেছেন, নাহলে 412টি পরিবারের সবাই যদি থাকতেন তাহলে জায়গাটা নরকের থেকেও খারাপ হয়ে উঠত।

ঐ মিলের আর একটা বস্তির নাম 'চিনিকুঠি' লাইন। আমরা এই লেখাটার জন্যে আর সেখানে যাইনি। আপনিও আমাদের সাথে নিশ্চয়ই না যাওয়ার ব্যাপারে একমত হতেন···কারণ সেখানেও জল-আলো নেই—অর্থাৎ আরো খানিকটা ডাঁই-করা গু-মুত আর নাকের জ্বালাতন না করলেই বা কি এসে যায়। এবার ভাবুন আরো হাজার হাজার কারখানা বন্ধ·····তার কুলি লাইন···তার টন-টন 'ঐ সব'··· তার ফলে হাজার হাজার আন্ত্রিকের রোগী, চামড়ার খোশপাঁচড়া, পাটের আঁশের বুকের ভেতর ঢোকা এবং না খেতে পাওয়া—ফলত যক্ষ্মা···আপনার আমার কি? বলা যায় না···রোগ-জীবাণুরা কিন্তু বাবুদের বাড়ীতেও ঢুকে পড়তে পারে (যদিও এটা একটু কঠিন কাজ জীবাণুদের পক্ষেও)!

আচ্ছা, আপনারও কি মনে হয় 'বিপ্লব না হইলে কিছু হইবো না'? বরানগর জুট মিলের মজদুর কমিটি অবশ্য বিপ্লব পর্যন্ত অপেক্ষা করার

কথা ভাবছে না, কারখানা খোলার দাবীর সাথে সাথে তারা শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারেও সচেতন। ইতিমধ্যেই একটা নাগরিক কনভেনশন হয়েছে স্থানীয় নাগরিকদের, যেখানে তাঁরা জানিয়েছেন তাঁদের জল-আলোর সমস্যার কথা, তাঁদের আবর্জনায় ভরা পরিবেশের কথা। নাগরিকদের অনেকেই এগিয়ে এসেছেন আর থেকেছেন শ্রমিকদের পাশে। মিউনিসিপ্যালিটিতে একযোগে ডেপুটেশন দিয়েছেন ন্যূনতম নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের দাবী করে। মিউনিসিপ্যালিটি এবং মালিক পরস্পরের ঘাড়ে দোষ এবং দায়িত্ব চাপাচ্ছে। পাশাপাশি মজদুর কমিটি সপ্তায় তিনদিন ফ্রি-ক্লিনিক চালাচ্ছে, তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন কয়েকজন ডাক্তার, বেশ কিছু সংগঠন অথবা ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ। শ্রমিকরা এবং তাঁদের সহযোগী বন্ধুরা বুঝতে পারছেন আন্দোলনের সাথে নিজেদের স্বাস্থ্য পরিবেশ, পারস্পরিক সম্পর্ক এসবের দেখ-ভাল্ নিজেদেরই করে নিতে হবে। এখানে স্পষ্ট করে একটা কথা বলা যায়—যদি আশে-পাশের দু একটা পাড়ার ক্লাব একটু উদ্যোগ নেয় তাহলে জনা পঞ্চাশ লোক দু-এক দিনের প্রচেষ্টায় সব আবর্জনা সাফ ক'রে সুন্দর পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে পারে। এই সামান্য কাজের জন্যে বেঁচে যেতে পারে বেশ কিছু প্রাণ। প্রতি বছর যারা রুটিন করে মারা যাচ্ছে তাদের অধিকাংশকেই বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব যদি শুধু এটুকু কাজই করা হয়। আপনি হয়ত বলবেন বাইরে থেকে গিয়ে একদিন পরিষ্কার করে এসে লাভ কি ? আবার তো কয়েক দিনে জমে উঠবে নোংরা। ঠিকই—। এজন্যে স্বাস্থ্যকর থাকার জায়গার ধারণা তৈরী করতে হবে যাঁরা ওখানে আছেন তাঁদের মধ্যে। সত্যি বলতে ওরকম পরিবেশে যাঁরা থাকেন তাঁদের এই সচেতনতাও গড়ে ওঠবার সুযোগ ঘটে না। মজদুর কমিটিকেই দায়িত্ব নিতে হবে এসব ব্যাপারে সাধারণ শ্রমিকদের শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে।

সবশেষে আর দু'একটা খবর জানাই (এতে আমাদের রাতদিন বয়ে-বেড়ানো হতাশাটা হয়ত একটু ধাক্কা খাবে)—ক্লিনিকটা চলছে ভালই, আশে পাশের বাসিন্দারা তাঁদের অব্যবহৃত ওষুধপত্র দিয়ে সাহায্যও করছেন—যে শ্রমিকেরা বাড়ী বাড়ী এইসব সাহায্য চাইতে যাচ্ছেন তাঁরাও এতে খুবই উৎসাহিত, ঠিক হয়েছে শ্রমিক এবং সহযোগী বন্ধুরা মিলে একদিন জঞ্জাল পরিষ্কার করা হবে। □

[ এই রিপোর্টটি অন্যান্য বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে তৈরী করেছে আমাদের বন্ধু **বিশ্বজিৎ** ( **বিশু** )। ]

---

শ্রমিকের প্রাপ্য পি এফ, ই এস আই-এর টাকা মেরে বেআইনীভাবে বরানগর জুট মিল বন্ধ করে দিয়ে পালিয়ে গেছে মালিক। শ্রমিকরা কিন্তু পালিয়ে যাননি। 'মজদুর কমিটি' তৈরী করে লড়াই করছেন কারখানা খোলার জন্য। এই অবস্থায় তাঁদের দরকার একটু সহযোগিতা ও সাহায্য। যে কোন মঙ্গলবার সন্ধেবেলায় চলে আসুন মিলের পাওয়ার হাউস্ গেটের কাছে মজদুর কমিটির ইউনিয়ন অফিসে। লড়াইরত শ্রমিকদের মনোবল বাড়াতে সাহায্য করুন।

অর্থ সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা ঃ

**শ্যাম দাস**, সাধারণ সম্পাদক
বরানগর জুট মিল মজদুর কমিটি
54, রামচন্দ্র বাগচী লেন
আলমবাজার, কলকাতা-700035

---

# লাভ ক্যানাল—এখন অতীতের পাতায়

অনুবাদ

নায়েগ্রা ফলস্-এর কাছে এক প্রাকৃতিক জলপ্রপাত 'লাভ ক্যানাল'। একদা'র বিস্ময় এবং বিখ্যাত সাঁতারের স্থান এই লাভ ক্যানাল লম্বায় 3,000 ফুট, চওড়ায় 60 ফুট এবং গভীরতায় 10 ফুট। কিন্তু আজ এই ক্যানালের সৌন্দর্য, বিস্ময় সবই অতীত, খরচের খাতায়। কারণ '40-এর দশকে ওলিন করপোরেশন এবং হুকার কেমিক্যালস্ লাভ ক্যানালকে তাদের রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ ফেলার জায়গা হিসেবে গণ্য করত। 10 বছর ধরে কোম্পানী দুটি এই জায়গাটিতে 21,000 টনেরও বেশী বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ জমা করেছিল।

লাভ ক্যানালে বর্জ্য বস্তু জমা রাখার কথা পৃথিবীর মানুষ জানতেই পারত না, যদি না ঘটত 1976 সালের প্রচন্ড বৃষ্টিপাত। ঐ বছরের বৃষ্টিপাতে দেখা গেল লাভ ক্যানাল অঞ্চলের জলের মাত্রা দ্রুত ওপরে উঠছে, এক অজানা রাসায়নিক পদার্থে ডুবে যাচ্ছে বাড়ী-ঘর। বাচ্চা-বুড়ো সকলেরই হাত পায়ে দেখা দিচ্ছে রাসায়নিক ফোস্কা, এবং বাড়ীর কুকুর বেড়াল হঠাৎ-হঠাৎ মারা যাচ্ছে। এরই সঙ্গে এক অজ্ঞাত অগ্নিদাহে জ্বলছে সব্জিভরা বাগান, ক্ষেত, ইত্যাদি। শুরু হল শোরগোল—এখানে এত রাসায়নিক পদার্থ এল কি করে? জল মাটি বাতাসের দ্রুত সমীক্ষার ফলে জানা গেল সাধারণ নিরাপদ মাত্রার তুলনায় কয়েকশো গুণ বেশী দূষিত এই অঞ্চল, এবং এখানকার জনসংখ্যার মধ্যে অস্বাভাবিক হারে গর্ভপাত, বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম, ক্যান্সার, হাইপার-এ্যাকটিভিটি, এ্যাজমা, নার্ভাস ব্রেকডাউন ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে।

প্রক্রিয়াটা চলেছিল 30 বছর ধরে এবং আসল চালাকিটা করেছিল হুকার কোম্পানী। 1953 সালে হঠাৎ জনহিতৈষী হয়ে ওঠা এই কোম্পানী রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থে পরিপূর্ণ এই লাভ ক্যানালকে স্থানীয় শিক্ষা বোর্ডের কাছে বেচে দেয় নামমাত্র ডলারে—এখানে একটি স্কুল তৈরীর উদ্দেশ্যে। কি ধরনের বিষাক্ত পদার্থ এখানে জমা আছে এবং তার থেকে কি ধরণের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এ সবই ছিল কোম্পানী দুটির জানা তথ্য। অথচ তারা জনহিতৈষণার নামে সে সব চেপে গেল, যাকে চরম নোংরামো ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। আর সেইজন্যই এই জায়গা বাবদ তাদের প্রাপ্য টাকা-পয়সা নিয়ে তারা বেশী টানা-হ্যাঁচড়া করে না, দাবি-দাওয়া সহজেই ছেড়ে দেয়। 1958 সাল থেকেই কোম্পানীর হাতে বিষাক্ত লাভ ক্যানালের আবহাওয়ার খবর আসতে থাকলেও কোম্পানী স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানায় না—কী দারুণ বারুদ স্তূপের উপর তারা বাস করছে! উপরন্তু এখানকার বর্জ্য পদার্থ-জাত যাবতীয় দায় দায়িত্ব এক অজানা জনগোষ্ঠীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে বছরের পর বছর।

এর পরের ঘটনা তো 1976 সালের প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত। সমস্ত তথ্য প্রমাণাদি

হাতে থাকা সত্ত্বেও কোম্পানী কর্তৃপক্ষ নিজেদের যাবতীয় দায়দায়িত্ব অস্বীকার করে আক্রান্ত জনবসতির ঘাড়েই সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেয়। এমনকি এক দূরদর্শন অনুষ্ঠানে রাসায়নিক প্রস্তুতকারক সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট সরাসরিই বলেন যে—"আসলে লাভ ক্যানাল জনবসতির সব লোকই কমবেশী স্নায়বিক রোগের শিকার—ওসব শিল্প দূষণ-টূষণ বাজে কথা।"

1979-তে লাভ ক্যানেল জনবসতির 17 জন গর্ভবতী মায়ের মধ্যে মাত্র দুজন যখন সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম হন, তখনই নিউ-ইয়র্ক কর্তৃপক্ষ এই অঞ্চলটাকে 'কবরস্থান' আখ্যা দিয়ে স্কুল বন্ধ করে দেন। বাড়ীঘর ভেঙ্গে ফেলা হয় 200 টার মত এবং সরকার 1000টি পরিবারকে 100 মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দিয়ে এ ব্যাপারে সবিশেষ ইতি টানেন। যদিও আমেরিকার পরিবেশ নিরাপত্তা এজেন্সী (ই পি এ)-এর মতে—"লাভ ক্যানালের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেছে তাই সরকার ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। কিন্তু এ যাবৎ 4000-5000 টার মত এই ধরণের ঘটনা বর্তমান, অথচ সঠিক তথ্য প্রমাণের অভাবে কিছুই করা যাচ্ছে না।" □

সংক্ষেপিত অনুবাদ—কাজল রায়

সূত্র—ইকো ওয়রস—ডেভিড ডে

আলিপুর তাজ হোটেলে ডিপো-প্রভেরা প্রস্তুতকারক কোম্পানী ম্যাক্স ফার্মা আপ্যায়িত করছে নামীদামী চিকিৎসকদের। উদ্দেশ্য ডিপো-প্রভেরা বিক্রি বাড়ান। দিন—27 আগষ্ট। সময়—সন্ধে ছয়টা। আমরাও যাব। প্রতিবাদ করব ব্যবসার নামে এই বিপজ্জনক ওষুধ বাজারে চালু করার বিরুদ্ধে। আপনিও আসুন। সঙ্গে আনুন বন্ধু-আত্মীয় সমস্ত সামাজিক ভাবে দায়িত্বশীল মানুষদের।

# ডিপো-প্রভেরা ঃ একটি বিপজ্জনক গর্ভ-নিরোধক

**যা হতে পারে ঃ**

একটা নতুন ইনজেকশন পাওয়া যাচ্ছে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য, একবার নিলে তিন মাস সন্তান হবে না। ধরুন আপনি এটা নিতে চান। ডাক্তারবাবু ইনজেকশন দেবার আগে একটা কাগজে সই করতে বললেন, অপারেশনে যেমন সম্মতি দিতে হয়, তেমনি। ইনজেকশন দেবার পরে ঋতু অনিয়মিত হতে লাগল, ডাক্তারবাবু বললেন 'ভয় নেই, প্রথম প্রথম এরকম হবে। পরে ঠিক হয়ে যাবে।' ভরসা করে আপনি 2-3 বছর নিয়ে গেলেন। ঋতু একেবারে বন্ধ হয়ে গেল, খুব মোটা হয়ে গেলেন, হঠাৎ একদিন বুকে যন্ত্রণা হল। দেখা গেল হাই প্রেশার, হৃদযন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত। অথবা আপনি মানসিক অবসাদের রোগী হয়ে গেলেন। কিম্বা, এসব কিছুই হল না, বছর পাঁচেক পরে সামান্য হোঁচট খেয়েই আপনার কোমর বা শিরদাঁড়ার হাড় ভেঙে গেল। আপনি তখন কি করবেন ? একমাত্র ঋতুর গোলমাল ছাড়া বাকী সব কটা অসুখ যে ওই ইনজেকশন নিয়েই হয়েছে, এটা তো আপনার মাথাতেই আসবে না। আর যদি এটা বোঝেনও, এই ভোগান্তির ক্ষতিপূরণ কে দেবে ?

**ইনজেকশনটি কি ?**

শুনতে গল্পের মতো মনে হলেও বাস্তবে ওপরে বর্ণিত ঘটনাটা ঘটতেই পারে। ইনজেকশনটি হচ্ছে ডিপো-প্রভেরা, বা ডিপো মেড্রক্সি প্রজেস্টেরোন অ্যাসিটেট। প্রস্তুতকারক ও আবিষ্কর্তা আমেরিকা-ভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানী 'আপজন'। পৃথিবীর প্রায় 90টি দেশে শুধু এটি বিক্রি হয় বছরে 300 কোটি টাকার মত। ভারতে আপজন-এর সহযোগী কোম্পানী হিসেবে এটা বাজারে এনেছে ম্যাক্স ফার্মা, ইণ্ডিয়া। বাজার-দর প্রতিটি 124 টাকা।

**জনস্বার্থ, না বিপজ্জনক ব্যবসা**

কোম্পানী বলছে ভারতের মহিলাদের জন্য অনেক রকম গর্ভ নিরোধকের তালিকায় তারা একটা নাম যোগ করেছে মাত্র। ডাক্তারবাবুদের দায়িত্ব দেখে শুনে ওষুধ দেওয়া, কোম্পানী তো ইনজেকশনের সাথে সাথে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য তাঁদের দিয়ে দিয়েছে। কাউকে তো তারা জোর করছে না, আপনি বুঝে শুনে কিনুন !

জোরদার বিজ্ঞাপনের আড়ালে যে কথাটা চাপা পড়ে যাচ্ছে যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফুড্ অ্যাণ্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফ ডি এ) তাদের দেশেই 1967 থেকে 1992 সাল পর্যন্ত এটা সাধারণের ব্যবহারের জন্য অনুমতি দেয়নি। ধনী দেশে এটা মানসিক প্রতিবন্ধী, আদিবাসী, উদ্বাস্তু, কালো চামড়ার বা গরীব মেয়েদের ওপরেই প্রয়োগ হয়েছে প্রধানত। আর এদের অনেকেরই অনুমতি নেওয়ারও প্রশ্ন ওঠেনি কখনও। আসলে গরীব দুনিয়াতেই ডিপো-প্রভেরা গত 15-20 বছর ধরে ব্যবসা করছে চুটিয়ে। আমেরিকার

সিকিউরিটিজ, অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে আপজন কোম্পানী জানিয়েছে যে বিদেশে সরকারী সংস্থায় জন্ম-নিরোধক বেচার সুযোগ পাওয়ার জন্য তারা দু কোটি সত্তর লক্ষ টাকার মত ঘুষ দিয়েছে। বিভিন্ন দেশের হাসপাতালগুলোতে সুবিধে পাওয়ার জন্য তাদের খরচ করতে হয়েছে এক কোটি চল্লিশ লক্ষের মত টাকা। —এই হল ব্যবসার গোপন রহস্য।

## ডিপো-প্রভেরা ঃ আমাদের দেশে

ভারতে প্রথমবার ডিপো-প্রভেরা নিয়ে পরীক্ষামূলক ব্যবহার শুরু হয় '70 এর দশকে। এই পরীক্ষাকে অবশ্য বাতিল ঘোষণা করা হয়, ফলাফলও প্রকাশ করা হয়নি। এরপর 'ডিপোর' নাম শোনা যায় '77 থেকে '80 সাল পর্যন্ত চলা 'বিভিন্ন রকম গর্ভ-নিরোধকের ব্যবহার' সংক্রান্ত এক গবেষণায়। এই পরীক্ষায় মোট 360 জনের মধ্যে 'ডিপো' ব্যবহার করেন 34 জন। এঁদের মধ্যে অস্বাভাবিক রক্তপাতে ভয় পেয়ে মাঝপথেই ছেড়ে দেন 25 জন। কাউকেই জানানো হয়নি যে ইনজেকশনটি পরীক্ষামূলক অবস্থায় আছে, যদিও গবেষণাটি চালানো হয়েছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাহায্যে।

দুনিয়া জুড়ে সমালোচনার ফলেই হয়ত গর্ভনিরোধক নিয়ে পরবর্তী ট্রায়ালগুলোতে ভারতীয় স্বাস্থ্য জগতের কর্তাব্যক্তিরা অন্য একটি ইনজেকশন 'নেট-এন'-এ সরে যান! এরপর মাঝে মাঝেই পরিবার-পরিকল্পনাকেন্দ্রীক কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও ডাক্তারদের তরফ থেকে ডিপো-প্রভেরা আমদানী ও ব্যবহার করার জন্য চাপ আসতে থাকে। তবে বিভিন্ন নারী সংগঠনগুলির প্রতিরোধ ও খোদ আমেরিকা মুলুকের নিষেধাজ্ঞা দরজাটা বন্ধ করেই রেখেছিল। সেটা খুলল নয়া অর্থনীতি ও খোলা বাজারের যুগেই। আমেরিকায় সবুজ সংকেত পাওয়ার আট মাসের মধ্যেই 1993 সালের 11 জুন এক চুক্তির ফলে ম্যাক্স ইন্ডিয়া (এরাই ম্যাক্স ফার্মা) কোম্পানী নেপাল ও ভুটানসহ ভারতে এটি বিক্রির অধিকার পায়। লক্ষ্য করার বিষয় যে এই ওষুধ কোম্পানীর আশীর্বাদপুষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'ফ্যামিলি প্ল্যানিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া' সরকারি জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে ডিপো-প্রভেরা ঢোকানোর জন্য যথেষ্ট চীৎকার শুরু করেছে। আপজন-এরই দেওয়া তথ্যে 'আপ্যায়িত' কিছু নামীদামী ডাক্তার-বাবুরাও ডিপো-প্রভেরাকে খুব সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, যদিও এটি এদেশে ব্যবহারের কোনো অভিজ্ঞতাই তাঁদের নেই।★

## ছাড়পত্র—সন্দেহজনক

যে কোন নতুন ওষুধ মানুষকে দেওয়ার আগে প্রাণীর ওপরে পরীক্ষা করতে হয়। এটাই বৈজ্ঞানিক নিয়ম। কুকুর ও বাঁদরের শরীরে ডিপো-প্রভেরা দিয়ে দেখা গেছে এটা স্তন ও জরায়ুকন্ঠের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। অথচ তৃতীয় বিশ্বের মেয়েদের এটা কেন দেওয়া হল?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এখন বলছে যে কুকুরের সঙ্গে মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই, ডিপো-প্রভেরা নিরাপদ! চারটি দেশে মানুষের ওপর পরীক্ষা চালিয়েই তারা নাকি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। এটা কি নিরপেক্ষ বিচার? আমাদের সন্দেহ থেকে যায়, কেননা আপজন কোম্পানীই এই পরীক্ষায় সাহায্য করেছে। এমন কি, ওদের রিপোর্ট খতিয়ে দেখলেও বোঝা যায়, অল্প বয়স্কাদের স্তনের ক্যানসার হবার ঝুঁকি ইনজেকশন নেবার পর হচ্ছে প্রায় দ্বিগুণ। অথচ এই রকম রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই তো ছাড়পত্র দেওয়া হল। কি বলা যাবে একে?

## সরকারি বক্তব্য

ভারতের ড্রাগ কন্ট্রোলার বলেছেন

★ ইউরোপ-আমেরিকায় আপজন কোম্পানী ইনজেকশনের সাথে দেওয়া তথ্যে 70-80টা পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার কথা লিখেছে। এদেশে লিখছে 7-8টা। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

যে '70 এর দশকে আই সি এম আর (ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিক্যাল রিসার্চ) যে ভারতে মহিলাদের ওপর ডিপো-প্রভেরা নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা করেছিল, বেশীর ভাগ মেয়েরা সহ্য করতে না পারায় সেটা চালানো যায়নি এসব কিছুই তিনি জানেন না। আর একটি ইনজেকশন নেট-এন যে এখনও পরীক্ষাধীন সেটাও তাঁর অজানা। তিনি মনে করেন এই সব রিপোর্ট ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া উচিত। সত্যিই তো, নয়া অর্থনীতির কল্যাণে যে কোনো ডাক্তারবাবু এখন যেকোনো ওষুধ বিদেশ থেকে আনাতে পারেন, চালাতে পারেন, তিনি কি করে আটকাবেন ?

তবে হ্যাঁ, অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য তিনি কড়া নিয়ম করেছেন— লিখিত সম্মতি এবং প্রেসক্রিপশন ছাড়া 'ডিপো' বিক্রি করা নিষিদ্ধ। আর তাঁর এই আদেশকে ব্যঙ্গ করেই বোধহয় দিল্লির কোনো দোকানদার ড্রাগ কন্ট্রোলারের নামে রসিদ করেই ওষুধটি তুলে দেয় নারী আন্দোলনকারীদের হাতে, যাতে তাঁরা সেটা দেখাতে পারেন ওষুধ জগতের এই সর্বোচ্চ কর্তাকে।

## কিছু চিন্তা-ভাবনা

আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত লোকই ভাবেন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণই সব সমস্যার এক নম্বর সমাধান। ডাক্তাররাও এর ব্যতিক্রম নন। ফলে অনেকের কাছেই বাচ্চা বন্ধ করাটা সম্ভাব্য মায়ের স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনার থেকে বেশী জরুরী। ধরুন, কোনো মহিলা দীর্ঘদিন 'ডিপো' ব্যবহারের ফলে বন্ধ্যা হয়ে গেলেন। এক একটা জীবনে এইরকম মহিলাদের যে চূড়ান্ত অশান্তি ও সামাজিক হয়রানি পোয়াতে হবে, সেই জীবনের দাম কে দেবে ?

ভাবুন তো, রোগী পিছু দশ মিনিট সময় যাঁরা দিতে পারেন না, সেই ব্যস্ত ডাক্তার আপনার শরীরে সম্ভাব্য সব প্রতিক্রিয়া খতিয়ে দেখবেন বা নিয়মিত আপনাকে নজরে রাখবেন ? সম্মতিপত্রে সই করিয়ে নিলে কার লাভ ? আপনার, না কোম্পানী বা ডাক্তারবাবুর ?

ড্রাগ কন্ট্রোলার কি খবর রাখেন যে শ্রীরামপুরের মত মফস্বল শহরেও ডিপো-প্রভেরা প্রেসক্রিপশান ছাড়াই পাওয়া যাচ্ছে ? যে দেশে বেশীর ভাগ মেয়ে পড়াশুনো জানেন না, হাতুড়েদের খপ্পরে পড়া থেকে তাঁদের বাঁচাবে কে ? কাদের স্বার্থে একটি বিপজ্জনক ওষুধকে লাইসেন্স দিয়ে আমাদের স্বাস্থ্যের অধিকার, জীবনের অধিকার, সন্তানধারণের ক্ষমতা ফিরে পাবার অধিকার কেড়ে নেওয়া হল ?

আমাদের সবচেয়ে বড় আশংকা যে সরকার এখন মেরী স্টোপস ক্লিনিকের মত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে এটা চালাতে অনুমতি দিলেও পরে জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমেও এটা চালু করবে। শুধু হৈ চৈ, প্রতিবাদ একটু কমার অপেক্ষা। এই ইনজেকশন তাঁদের বেশ পছন্দ। দেওয়াও সহজ, আর একবার দিলেই তিনমাস নিশ্চিন্ত। বিদেশী সাহায্যও পাওয়া যাবে দু হাত ভরে। কোম্পানীর তো পোয়া বারোই।

অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখেছি জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে, গর্ভ নিরোধক নিয়ে পরীক্ষার নামে, কি ভাবে বারে বারে নারীদের অধিকার ভঙ্গ করা হয়েছে। এটা কি তার ব্যতিক্রম হবে ? বলা হয় জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য পদ্ধতি বাছাইয়ের সুযোগ মানুষকে দেওয়া হচ্ছে, অথচ বাস্তবে দেখেছি সরকারী হেলথ সেন্টারে কেউ গর্ভপাত করাতে গেলে কপার টি পরানো বা বন্ধ্যাকরণ বাধ্যতামূলক !

তাই প্রশ্ন, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কি সব পরীক্ষা করে ডিপো-প্রভেরা দেওয়া হবে ? ভুল বশতঃ কোনো গর্ভবতী মা যদি এটা নেন তবে তাঁর বাচ্চা হতে পারে বিকলাঙ্গ, দুর্বল, মৃতপ্রায়। এটা নিয়ে যদি কেউ বাচ্চাকে দুধ খাওয়ান্, তবে বাচ্চার শরীরে এই হরমোন কোনো দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া তৈরী করতেই পারে। এসবের দায়িত্ব কার ? থ্যালিডোমাইড বা ডি ই এস কেলেঙ্কারীর মত শোচনীয় ঘটনা কি আবার আমরা ঘটাতে দেব ? □

—অমিতা

★ তথ্যসূত্র বা আরো তথ্যর জন্য লেখিকার নামে, বি ও বি-র যোগাযোগের ঠিকানায় লিখুন।

**With Best Compliments From**

# ASHIS KUMAR DAS

GOVT. CONTRACTOR ENLISTED CLASS-III

VILL—NILRATAN COLONY
P. O.—RAGHUNATHGANJ
DIST—MURSHIDABAD

# স্কুলপাঠ্যে 'মানবাধিকার বিষয়'

পরিক্রমা : এক

স্কুলের ছেলেমেয়েদের সামনে নতুন এক বিপদ আসন্ন। পাঠক্রমে বাড়তে পারে নতুন এক বিষয়ের বোঝা। এমনিতেই বিষয় ও বইয়ের ভারে নুইয়ে পড়ার অবস্থা। তার ওপর প্রস্তাব এসেছে 'মানবাধিকার প্রসঙ্গ' তাদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

এই মর্মে প্রস্তাব রেখেছেন সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস্ কমিশন বা সংক্ষেপে এন এইচ আর সি)-র চেয়ারম্যান। তাঁর এই প্রস্তাব অনেকের মনে ধরেছে। ফলে চালু হয়েও যেতে পারে। তা'লে অচিরেই মডেল পাঠ্য-পুস্তক রচিত হবে। স্বাভাবিক ভাবেই সে দায়িত্ব দেওয়া হবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মনপসন্দ্ কোনো লোককে।

প্রস্তাবে বলা হয়েছে শুরুতে স্কুলের প্রাথমিক স্তরেই অন্তর্ভুক্ত করা হবে বিষয়টি। তারপর পর্যায়ক্রমে ওপরের স্তরে এবং সবশেষে বিশ্ব-বিদ্যালয় স্তরে আলাদা 'ডিসিপ্লিন' হিসেবে চালু হবে।

ছোট্ট একটা সংশোধনের প্রস্তাব রাখব এই পরিকল্পনার জন্য। এতে গোটা ব্যাপারটা বেশ জমজমাটও হবে এবং তার সাথে কিছু বাজে ঝামেলাও এড়ানো যাবে।—কেন সে কথাটাই বলছি।

শুরুটা স্কুলের প্রাথমিক স্তর থেকে না করাই ভাল। উল্টো দিক থেকে শুরু করলে তবেই অনেকে উৎসাহ নেবে। তাতে কাজটা তাড়াতাড়ি এগোবে। এজন্য সব চেয়ে আগে বাছাই করা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বিশেষ কারো' নামাঙ্কিত অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করতে হবে। এতে তাঁরও গৌরব বৃদ্ধি পাবে এবং এর সাথে সে পদ অলঙ্কৃত করে কিছু কিছু শিক্ষিত ভদ্রলোকও সে গৌরবের অংশীদার হতে পারবেন।

অন্যদিকে কচি কচি ছেলেমেয়ে-গুলো আপাততঃ নতুন এই বোঝার হাত থেকে রেহাই পাবে। মার্চ মাস এলেই ওদের আর মানবাধিকার সনদের একগাদা অনুচ্ছেদ দুলে দুলে মুখস্ত করতে হবে না।

এতে অন্য একটা বাজে ঝামেলার সম্ভাবনাও এড়ানো যাবে। স্কুলের সব ছেলেই তো 'গোপালে'র মত 'বড় সুবোধ বালক' নয়। দু'একটা ফচ্‌কে ছোঁড়া সব স্কুলে সব ক্লাশেই থাকে। 'মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে কে?'—মাস্টারমশায়ের এহেন প্রশ্নের জবাবে 'আমি না স্যার'—গোছের রসিকতা সকলে নাও করতে পারে। মানবাধিকার লঙ্ঘন সত্যিই কে বা কারা করছে তা আঙ্গুল তুলে দেখিয়েও দিতে পারে কেউ কেউ—তখন?

তখন কি স্বরাষ্ট্র দপ্তর 'বিশেষ ট্রেনিং প্রাপ্ত' বি এস এফ বাহিনীর জওয়ানদের স্কুলে স্কুলে পাঠাবেন মানবাধিকার বিষয়ে উচিত শিক্ষা দিতে? দেশের লক্ষ লক্ষ স্কুলে পাঠানোর জন্য 'ট্রেন্‌ড' বি এস এফ জওয়ান পাবেন কোথা থেকে?

ট্রেনিং-এর খবরটা আগে বলা হয়নি। এন এইচ আর সি-র চেয়ার-ম্যান উপরোক্ত প্রস্তাবের সাথে আরও একটি প্রস্তাব রেখেছেন। উনি বলেছেন স্কুলের ছেলেমেয়েদের পাশাপাশি বি এস এফ বাহিনীর জওয়ানদেরও মানবাধিকার বিষয়ে বিশেষ ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ তাদের কেবল খুন করার ট্রেনিংই দেওয়া হয় (…"ট্রেন্‌ড্ টু কিল…"—স্টেটস্‌ম্যান / 23.6.94)। একটু অন্য রকম ট্রেনিংও দরকার। তাই—। □

—র. চ.

# নর্মদা উপত্যকায় এখন

পরিক্রমা ঃ দুই

বর্ষা নেমে গেছে। সর্দার সরোবর বাঁধের নির্মাণ কাজ যে উচ্চতা অবধি হয়েছে সে অনুযায়ী কিছু কিছু গ্রাম অচিরেই জলের তলায় যাবে। ডুববে বেশ কিছু লোকের ঘর দোর জমি—মহারাষ্ট্র এবং মধ্যপ্রদেশ দু'রাজ্যেরই।

কোন কোন তালুকের কোন কোন গ্রাম ডুবছে, কাদের উচ্ছেদ হতে হবে তা রাজ্য সরকারগুলি থেকে আগেই জানিয়ে দেওয়ার কথা এবং তাদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে পুনঃস্থাপন করার কথা। সুপ্রীম কোর্টের রায় এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের শর্ত অনুযায়ী জলমগ্ন হওয়ার অন্তত ছ'মাস আগে এ কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা।

সে কাজ এখনও হয়নি। এদিকে রাজ্য সরকারগুলির দেওয়া হিসেবেও দেখা যাচ্ছে নানান গরমিল। এক এক সময় এক এক হিসেব দিচ্ছে—বিভিন্ন ফোরামে। এ থেকে প্রকৃত অবস্থা বোঝা দুষ্কর।

এ বছর মার্চ মাসে মহারাষ্ট্রের ত্রাণমন্ত্রী বিধানসভায় জানিয়েছিলেন যে এই বর্ষায় ধুলে জেলার দুটি তালুকের মোট 693টি পরিবারের ঘরদোর-জমি জলের নীচে যাবে। অথচ ঠিক আগের বছরের আগস্ট মাসেই এক রিভিউ কমিটিকে দেওয়া হিসেবে সরকার জানিয়েছিল যে ওই এলাকার 1769টি পরিবার উচ্ছেদ হবে।—প্রশ্ন হল, কোনটা ঠিক ?

এদিকে মধ্যপ্রদেশ সরকার গত বছর জানিয়েছিল এই বর্ষায় 15টি গ্রামের দুহাজার পরিবারকে উচ্ছেদ হতে হবে। অথচ এ বছর মে মাসে ইন্দোর হাইকোর্টের এক শুনানীতে রাজ্য সরকারের এক প্রতিনিধি জানিয়েছেন, এই বর্ষায় মাত্র 'দুটি' পরিবার উচ্ছেদ হবে !—এক্ষেত্রেও প্রশ্ন, কোনটা ঠিক !

তবে সব দিক দেখে মনে হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ সরকার নর্মদা প্রকল্প নিয়ে একটু ধীরে এগোনোর পক্ষপাতী। তাদের এই মনোভাবের কারণ—নর্মদা প্রকল্প অন্তর্গত বিভিন্ন সংস্থা ও রাজ্য সরকারগুলির পরস্পরের মধ্যে এক ধরণের টানাপোড়েন চলছে।

মধ্যপ্রদেশ সরকার সর্দার সরোবর বাঁধের উচ্চতা 455 ফুট থেকে কমিয়ে 436 ফুট করার দাবী থেকে এখনও সরে আসেনি। যেটা আর কেউই চাইছে না।—গুজরাট সরকার তো নয়ই। ফলে মধ্যপ্রদেশ সরকার পরোক্ষে চাপ সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশ সরকার কেন এই দাবী নিয়ে এত চাপাচাপি করছে সেটা অনুমানের বিষয়। মনে যাই থাকুক সরকারী ভাষ্যে বলা হয়েছে—'যেকোনো অবস্থাতেই তারা উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষদের স্বার্থ জলাঞ্জলি হতে দেবেন না বা তাদের সাথে সংঘর্ষের পথে যাবেন না।' প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখতে হবে একদম গোড়া থেকেই বাঁধ এলাকার ধনী চাষীদেরও এই দাবীই ছিল। তাঁরা বাঁধের বিরোধিতা করছিলেন না। তাঁদের দাবী ছিল বাঁধের উচ্চতা কমাতে হবে। তা'লে অনেকখানি উর্বর জমি বাঁচবে !

ইতিমধ্যে 'নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন' বর্ষার আগেই উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের ডাক দিয়েছে। প্রস্তাবিত জলডুবি এলাকায় সত্যাগ্রহীরা কুঁড়ে বানিয়ে অবস্থান করবেন। তাঁদের লক্ষ্য হবে—'জান দেব, মাটি নয়'। ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্র পুলিশ চিমলখেড়ি গ্রামের কয়েকটি কুঁড়ে ভেঙ্গে দিয়েছে। আন্দোলনকারীরা বলেছেন আবার এগুলো গড়ে তুলবেন তাঁরা। এই সময় বিভিন্ন রাজ্যের বন্ধুদের সেখানে হাজির থাকার জন্য সংগঠকদের তরফ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে। মনিবেলীতে পুলিশের ধরপাকড় শুরু হয়ে গেছে। আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক মেধা পাটকরকে গুজরাট পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পরিস্থিতি ক্রমে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। □

—র. চ.

# বিশ্বকাপ ঃ একটু ভাবুন

উন্মত্ত কোলাহল আপাতত শেষ। আর এই নীরবতার মধ্যেই নীচু গলায় কথা বলে ওঠে যুক্তি। হ্যাঁ, বিশ্বকাপ জ্বর এবারের মত নেমেছে। ভাবতে ইচ্ছে করে শীর্ণকায় সেই মানুষটির কথা। অফিস টাইমের তারকেশ্বর লোকালের দমবন্ধ করা ভীড়কে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছিল ক্রোধ আর হাহাকার মেশানো তাঁর গলা। 'ওরা মারাদোনাকে খেলতে দিল না।' ইনি হলেন সেই অসংখ্য মানুষদের একজন গত এক মাস যাঁদের বিনিদ্র রাত কেটেছে টেলিভিশনের পর্দার সামনে। গোলের মধ্যে আছড়ে পড়া উত্তেজনায় যাঁরা গলা ফাটিয়েছেন। চীৎকার করে তর্ক করেছেন কে ভাল কে মন্দ এই নিয়ে, কিম্বা সুযোগ পেলেই কিনে ফেলেছেন সুপার স্টার 'বাজ্জো'র পনিটেলের রহস্যর মতো চুটকিতে ভরপুর কোনো পত্রিকার 'বিশ্বকাপ স্পেশাল', রঙিন পোস্টার। তাতে যদি মাসিক বাজেটে টান পড়ে তো পড়ুক না দৈনন্দিন একঘেঁয়ে জীবনের ক্লান্তি থেকে তো একটু মুক্তি পাওয়া যাচ্ছে, তাই না ? খেলাধুলো তো নির্দোষ আনন্দ ?

তবু তো শেষরক্ষে হয়েছে। ব্রাজিল জিতেছে। স্বস্তির ঢেউ লেগেছে অফিস-কাছারি, রোয়াক থেকে দূর গ্রামের ক্লাবঘর অবধি। টিভির হাত ধরে এ ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে গরীব দুনিয়া জুড়ে। আর খোদ ব্রাজিলে..... হাজার হাজার মানুষের জয়োল্লাসের মত্ততা সেখানে আকাশে বাতাসে।

আর এরই মধ্যে কথাটা টুকুস করে বলে ফেলেছেন সেই দেশেরই এক সাংবাদিক 'ফুটবল ছাড়া ব্রাজিলবাসীদের আর কিই বা আছে, বহুদিন ওরা প্রাণ খুলে হাসতে পারেনি'। হ্যাঁ, পাহাড়ের মত দুর্নীতি, আকাশ ছোঁয়া বাজার দর, আকণ্ঠ দেনা আর মুখ খুললেই শাসকের রক্তচক্ষু—কে ভুলিয়ে দিতে পারে এইসব যন্ত্রণা ও অপমান ? কে ফিরিয়ে আনতে পারে সেই আহত ইগো ? জাতির সম্মান ?

তবে সব চিঁড়ে তো আর আবেগ দিয়ে ভেজে না। তাই বিশ্বকাপ নিয়ে দুনিয়াজোড়া জুয়া ও তার ফলস্বরূপ কোটি কোটি টাকা এদিক-ওদিক করতে খেলার গড়াপেটা করতে হয়। আর এর জন্য আঙুল নাড়াতে হয় মাফিয়া কর্তাদেরই। এমনিতেই অবশ্য পৃথিবীখ্যাত ক্লাবগুলো পরিচালনা করতে তাঁদেরই হাত লাগাতে হয়। তা না হলে ডাঁই ডাঁই কালো টাকাকে সাদা করার ঝক্কি সামলাবে কে ? আর খেলোয়াড় ? তাকে তো কেনা বেচা করা হয়, তাই তাকে হয়ে উঠতে হবে সবচেয়ে নিখুঁত যুদ্ধের ঘোড়া ! বন্ধুত্ব, সহযোগিতা এসব শব্দ তার নৈতিকতার অভিধানে থাকবে না ! রোমান গ্লাডিয়েটারের মতো তাকে শুধু লড়ে যেতে হবে। পড়ে গেলেই অতল অন্ধকার.....

না, টিভির পর্দায় নেপথ্যের কাহিনী ধরা পড়ে না। ধরা পড়ে না কিভাবে ফুটবল ক্লাব পরিচালক দেশ-পরিচালক হয়ে যান ফুটবলের উন্মাদনা, ফুটবলের শ্লোগানকে সামনে রেখে ! ধরা পড়ে না মনের কোন্ বিকৃতিতে খেলা যুদ্ধ হয়ে ওঠে। হিংসা ছড়ায়, ক্রোধ ও ঘৃণা তৈরী করে। যার বলি হয় সাধারণ মানুষ অথবা নির্দোষ কোনো খেলোয়াড়। ভাবলে হতবাক হয়ে যেতে হয় কি প্রচন্ড শক্তি আজকের সংবাদ মাধ্যমগুলোর যাদু-ছোঁয়ায়, যার প্রভাবে আধপেটা খাওয়া, অপুষ্টিতে ভোগা সেই মফস্বলবাসী ডেলিপ্যাসেঞ্জার মাদক চোরাচালানের মত জঘন্য কাজের সাথে যুক্ত ফুটবল-তারকার যন্ত্রণা নিজের করে নেন।

একে কি বলব ? মানসিক প্রোগ্রামিং ? সত্যিই কি ইলেকট্রনিক মিডিয়া বাস্তবকে বেঁকিয়েচুরিয়ে দিতে পারে ? না কি গণমানসেই সুপ্ত আছে নানান বীজ, টেলিভিশনের মতো মাধ্যম তাকে শুধু জাগিয়ে তুলছে ? প্রশ্ন, অস্বস্তি তো অনেক। আমরা শুধু বলব নীল আকাশের নীচে সবুজ ঘাসের ওপর চামড়ার গোলকের পেছনে ধাবমান বালকরা যেন হারিয়ে না যায় টিভি স্ক্রীনের সামনে। বোতাম টিপে যেন ফুটবল তারা না খেলে। □

একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রযত্নে অভিজিত লাহিড়ী
পি 252, লেক টাউন,
ব্লক এ কলকাতা-700089

আর এন 34929/79
ষষ্ঠদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা
জুলাই—সেপ্টেম্বর '94

* 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'কে ঠিক সময়ে উপযুক্ত বিষয়বস্তু সহ প্রকাশিত হতে সাহায্য করুন।

* লেখা পাঠান—'উন্নয়ন' কে ঘিরে বিতর্ক বা পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত রচনা—গণস্বাস্থ্য বা নিউক্লিয়ার শক্তি সব কিছুই বি ও বি সাদরে গ্রহণ করবে। বিশেষ অনুরোধ—স্থানীয় সমস্যাভিত্তিক রিপোর্ট, অনুসন্ধান বা সমীক্ষার জন্য বি ও বিতে নিয়মিত বিভাগ রাখা হচ্ছে। এই বিভাগে লেখা পাঠান।

* গ্রাহক হোন, কাছের মানুষদের গ্রাহক হতে সাহায্য করুন। একটি ছোট্ট উদ্যোগকে বাঁচিয়ে রাখতে আপনার সহযোগিতা খুবই জরুরী।

* বি ও বি পাওয়া যাচ্ছে—শিয়ালদা নর্থ স্টেশন—প্রথম গেট, উৎস মানুষ, বুক মার্ক ও রাসবিহারী—আশুতোষ মুখার্জী রোড জংশন।

---

যাঁরা কাজ করেছেন—কম্পোজ ☐ গীতশ্রী সেন, স্বপন সেন, দুলাল বোস ॥ মেক আপ ☐ স্বপন সেন ॥
মেশিনম্যান ☐ কালীবাবু ॥ বাইণ্ডিং ☐ লক্ষণ দাস ॥ মুদ্রক ☐ সমুদ্র ঘোষ।

বি ও বির পক্ষ থেকে—স্বাতী, সত্যব্রত, শেখর, অলক।

প্রচ্ছদ ☐ রবীন চক্রবর্তী।

---

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে প্রিন্টিং পার্বলিসিটি,
117, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-9, ফোন—350-7967 থেকে মুদ্রিত।